ত্রৈমাসিক

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ ঃ ৬ সংখ্যা ঃ ২২
এপ্রিল-জুন ২০১০

ISSN 1813-0372

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০১০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮ সম্পাদনা বিভাগ, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯ বিপণন বিভাগ
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA 11051
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠা ৫-৭

সম্পাদকীয়

বিচার বিভাগই ইসলামের সমগ্র শক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে

মুসলমান শব্দটি একক অর্থবোধক হলেও এর মধ্যে ঘটেছে বহুজনের সমাবেশ। অর্থাৎ বাংলায় শব্দটি একবচন কিন্তু মূলত বহুবচনকে ধারণ করে আছে। মুসলমান শব্দটি মূল আরবী 'মুসলিমুন' থেকে এসেছে। আর মুসলিমুন আরবীতে বহুবচন। অর্থাৎ বহু মুসলমান বা মুসলিম জনগোষ্ঠী। এর অন্তরনিহিত একটা তাৎপর্যের প্রতি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে হবে। আর সেটা হচ্ছে এই যে, ইসলাম মুসলমানকে একটি গোষ্ঠী ও উম্মাহ হিসাবেই বিবেচনা করে। অর্থাৎ মুসলমানরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ এবং 'বুনিয়ানুম মারসূস' তথা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ ও একীভূত হয় তখনই তারা হয় সত্যিকার মুসলমান। তখন তাদের মুকাবিলায় দুনিয়ার কোনো শক্তিই দাঁড়াতে পারে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' তথা খিলাফতে ইসলামীয়া মুসলমানদেরকে এই একক শক্তিতে বলীয়ান করেছিল। কিন্তু চার খলিফার পর যথার্থ খিলাফতের অবসানের পর হযরত আমীর মুআবিয়া রা. থেকে যখন পারিবারিক স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শুরু হয় তখন থেকে মুসলমানদের গোষ্ঠী চেতনার বুনিয়ানুম মারসূসের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। খিলাফতে যেখানে গোষ্ঠী চেতনা ও গোষ্ঠীস্বার্থ ছিল প্রবল সেখানে পারিবারিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তি স্বার্থ প্রবল হয়ে ওঠে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সমস্ত ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত করার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে খলিফা একটি প্রতিনিধিত্বশীল 'শূরা'র মাধ্যমে রাজনৈতিক পলিসি নির্ধারণ করতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। কিন্তু এখন সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি কখনো একটি শূরা গঠন করলেও তা হতো মূলত তাঁর নিজস্ব মতামতের অধীন এবং শূরার ওপর তাঁর মতামত হতো প্রবল। তাছাড়া সেই শূরায় আম জনতার প্রতিনিধিত্বের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দই হতো সিদ্ধান্তকর। এভাবে রাজনৈতিক পলিসি গঠন ও পরিচালনার ইখতিয়ার পুরোপুরি বাদশাহর হাতে চলে আসে। আর রাজনৈতিক পলিসির মাধ্যমে প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাও চলে আসে বাদশাহর হাতে। এই সংগে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ খিলাফত আমলে বাইতুল মাল যেখানে ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন সেখানে এমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি

শাসনের আমলে তার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বাদশাহর। এভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইসলামী আদর্শবাদের হাত থেকে বের হয়ে আসার ফলে ইসলামী আদর্শবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। গোষ্ঠী চেতনা ও সমগ্র উম্মাহর স্বার্থকে ছাপিয়ে ওঠে ব্যক্তি স্বার্থ।

মাত্র নবুওয়তের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইসলামী আদর্শবাদের ওপর আসে এ প্রচণ্ড আঘাত। তবে এক্ষেত্রে এমন একটি জিনিস ইসলামের কর্তৃত্বে থেকে যায় যা সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড সদৃশ। আর সেটি হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা। এই বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন আমলেই ইসলামী আদর্শবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার কৌশল অবলম্বন করে। বিচার ব্যবস্থার সীমিত পরিসরে ধীরে ধীরে ইসলামের শক্তিগুলো নিজেদের জায়গা করে নিতে থাকে। কাযী ও মুফতীগণই ছিলেন এ ব্যবস্থার পরিচালক। স্বৈরতন্ত্র তাদেরকে ক্রীড়ণকে পরিণত করার দীর্ঘ ও লাগাতার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এটা ছিল একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সংঘাত। একটা ক্ষুদ্র অংশ স্বৈরতন্ত্রের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিলেও ফকীহ, মুফতী ও কাযীগণের বৃহত্তম অংশ সবসময় স্বাধীনভাবে মর্যাদা ও কর্তৃত্বের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

যেহেতু আল্লাহর কিতাব সুবিন্যস্ত ও সুসংকলিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার মধ্যে বিকৃতির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সংগে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাদানকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলন এবং তা সমালোচনা পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছিল জোরেশোরে। ফলে একটি পূর্ণাংগ বিধান তার পরবর্তী বিকাশ ও উন্নয়নের পথ তৈরিতে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলছিল। আর মুসলিম উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট ছিলনা। তাই ঈমানদার, হকপরস্ত, স্বৈরতন্ত্রের সাথে আপোষহীন ফকীহ, মুফতী ও কাযীগণ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রথমদিকে ফকীহগণ স্বৈরতন্ত্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও ধীরে ধীরে তারা সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন ইসলামী নিযামকে প্রতিষ্ঠিত করার এই একটি মাত্র পথ খোলা আছে।

ফলে একদিকে কাযীর ফায়সালা হতে লাগলো। অন্যদিকে আইনের বিভিন্ন দিক ও পরিসর সামনে আসতে থাকলো। সেগুলোর ওপর কিতাব রচনার কাজ চলতে থাকলো। নতুন নতুন প্রশ্নের জবাবে ও সমস্যার সমাধানে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নতুন নতুন ইজতিহাদের কাজও চলতে লাগলো সমানতালে। ফলে একদল সুদক্ষ ফকীহ ও মুজতাহিদও ময়দানে নেমে আসলেন। সমগ্র মুসলিম জাহানে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দানের একটা সিলসিলা শুরু হয়ে গেলো। ইল্‌মী জগতে একটা কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ইল্‌মের সাগরে ঢেউ উঠলো এবং সে ঢেউয়ের সিলসিলা চলতে থাকলো শতশত বছর ধরে। ইসলামী শরীয়ত, ইসলামী আইন, ইসলামের অর্থব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও আইন কানুন, সামাজিক বিধান ও নিয়ম শৃংখলা, তাহযীব-তমদ্দুন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি এবং আদব কায়দা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজার হাজার লাখো লাখো গ্রন্থ রচিত হলো।

এসব মাত্র একটি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। বিচার ব্যবস্থা। মুসলমানরা ইসলামী জীবনযাপন করতে চায়। আর তা হবে যথার্থ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক। এজন্য চলতে থাকলো যাবতীয় আইন প্রণয়ন, ইজতিহাদ, গ্রন্থ রচনা, শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, সিলেবাস তৈরি ও শিক্ষা দান।

একটা দুর্বার সিলসিলা উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে রেখেছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে কয়েকশ বছর ধরে। রাজা বাদশাহ এবং স্বৈরাচারীকে তুষ্ট করার জন্য কোনো কিতাব লিখিত হচ্ছিলনা। বরং কর্ডোভা, কায়রোয়ান, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাগদাদ, দামেশ্‌ক, আলেপ্পো, কাশগড়, বুখারা, সমরকন্দ, গজনী, কানদাহার, মুলতান, দিল্লী পর্যন্ত যেসব হাজার হাজার লাখো লাখো কিতাব লেখা হচ্ছিল– সবই হচ্ছিল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একমাত্র বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও শাহী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকার কারণেই এত সবকিছু সম্ভব হয়েছে। কিছু লোভী ও স্বার্থান্ধ উলামার এখানে পদস্খলন ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তাঁরা কোনোদিন বৃহত্তর মুসলিম সমাজে প্রশংসিত ও গৃহীত হননি। গৃহীত হয়েছেন সত্যপন্থী এবং স্বৈরাচারের চোখে চোখ রেখে নির্ভয়ে হককথা উচ্চারণকারী উলামায়ে কেরাম। মুসলিম বিশ্বের হাজার হাজার লাইব্রেরীতে তাঁদের কিতাবগুলো আজো সযত্নে রক্ষিত আছে। সেগুলো ইসলামী আদর্শবাদকে সঞ্জীবিত এবং আজো সক্রিয় রেখেছে।

মুসলমান রাষ্ট্রগুলো এখন আর এককেন্দ্র, দুইকেন্দ্র বা তিনকেন্দ্র ভিত্তিক নয়। একুশ শতকে এসে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি হয়ে গেছে। তারা এককেন্দ্রে জমায়েত হতে পারছেনা। অনৈসলামী এবং ইসলাম বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের নবজন্ম ও পুনরুত্থানের কারণে পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ছায়া হিসাবে তাদের অনেকেরই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। পাশ্চাত্য বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা দেশ শাসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আম মুসলিম জনতা কি তাদের এই কুফরী শাসন মেনে নেবে? বিগত চৌদ্দশো বছর ধরে মুসলিম ফকীহ, মুজতাহিদ ও উলামায়ে কেরাম যে অকুতোভয় সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং মুসলিম জীবনকে কুফরী, শিরক ও অনাচার মুক্ত করার জন্য যেভাবে জীবনপাত করেছেন, কুরবানী দিয়েছেন বর্তমান যুগের উলামা, ফকীহ ও মুফতীগণ কি সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বেন? নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে কি তাঁরা মুত্‌মাইন ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন? আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন।

– আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুনঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ৯-২৮

ফিকহের উৎস

সুন্নাহ ঃ ফিকহের দ্বিতীয় উৎস

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি। ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা قول ও فعل কর্ম এবং تقرير অর্থাৎ অন্যদের এমন কথা ও কর্ম যেগুলো সম্পর্কে জেনে শুনে রসূলুল্লাহ স. মৌণ সমর্থন (নীরবতা) প্রদান করেছেন, সাহাবীগণের কথাও কর্মের স্বপক্ষে তাঁদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কর্মের কোন সনদ অবশ্যই রয়েছে। এই ভিত্তিতে সাহাবীগণের কথা এবং কর্ম ও সুন্নাতের অন্তরভুক্ত। যেমন উসূল গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে:

السنة تطلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم

"সুন্নাত বলা হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কর্ম এবং তাঁর নীরবতাকে আর সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মকে।"[১]

তবে হাদীস বলতে ফকীহগণের মতে শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীই বুঝায়। এই বিশেষ অর্থে ছাড়া তাঁদের দৃষ্টিতে অন্য কোন অর্থে 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার হয় না।[২]

কিন্তু মুহাদ্দিসগণের মতে রসূল স. এর কথা, কর্ম ও নিরবতা সবই হাদীসের অন্তরভুক্ত, তাকে সুন্নাত বা হাদীস যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন।

সুন্নাত ঃ নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারতের 'তুল্য'

আসলে কুরআন হচ্ছে যেন নকশা এবং সুন্নাতে রসূল যেন সেই নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত। যখন থেকে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের সিলসিলা শুরু হয়েছে নকশা (কিতাব)-র সাথে প্রকৌশলী (রসূল) পাঠাবার নীতিও তখন থেকে বরাবর কার্যকর

লেখক ঃ পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক আলেম, ওআইসির কেন্দ্রীয় ফিকাহ একাডেমীর সদস্য।

থেকেছে এবং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স.-এর নুবুওয়তে এসে সেই ধারার ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীর নির্মিত ইমারতটিকে একেবারে উপেক্ষা করে ইমারত নির্মাণ করলে তা কখনো আসল নকশা অনুযায়ী হতে পারে না।
অবশ্য প্রতি যুগের ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থা ও চাহিদার প্রতি নজর রাখা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৈরী ইমারতেও এদিকে নজর রাখা হয়। আমাদের কাজ হচ্ছে, ইমারতের মূল বুনিয়াদ ও খুঁটিগুলো অপরিবর্তিত রেখে আমাদের ইমারত নির্মাণ করা। আত্ম প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে মূল নকশার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ইমারতের বুনিয়াদ ও খুঁটিগুলো বিধ্বস্ত করা যাবেনা।

কুরআনে সুন্নাতের ভিত্তি

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে সুন্নতের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

وَانْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (سُوْرَةُ النَّحْلِ -٤٤)

"আর তোমার প্রতি আমি "যিক্‌র" (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের জন্য যে শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (بَيَانْ) দিতে পার এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।"
এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের 'ব্যাখ্যাতা' গণ্য করা হয়েছে।
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

اِنَّا اَنْزَلْنَاَ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ (النساء : ١٠٥)

"(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা বাত্‌লে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি ফয়সালা (حكم) করতে পারো।"
নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু বলে দিয়েছেন এবং তাঁর উপর মুবাল্লিগ (প্রচারক)-এর দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ (المائدة : ٧٦)

“হে রসূল! তোমার রব্-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো।”

রসূলুল্লাহ স. নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের মাধ্যমে কিংবা প্রচলিত রেওয়াজ গুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখার মাধ্যমে কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরতেন। এটিই ছিল তাঁর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত এবং প্রচার -এর পদ্ধতি, এবং সেই বায়ান, হুকুম-এবং তাবলীগের সমষ্টি হচ্ছে সুন্নাত যার ভিত্তি কুরআন মজীদ। এ কারণে সুন্নাতের নামে এমন কোনো জিনিস গ্রহণযোগ্য হবেনা যা কুরআন মজীদের বিপরীত। যেমন আল্লামা শাতধি বলেন :

ليس فى السنة الا واصله فى القران

“সুন্নাতে এমন কোনো বিষয় নেই যার মূল কুরআনে নেই (আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড)।

সুন্নাতের ব্যাপারে সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সাহাবীগণ সুন্নাতকে সক্রিয় ও কার্যকর রাখেন। হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক রা. (আল্লাহর হেদায়তের প্রকৃতি উপলব্ধির ব্যাপারে যিনি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রবর্তী)-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় :

كان ابوبكر اذ ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله تعالى–
فان وجد فيه ما يقضى به قضى به وان لم يجد فى كتاب الله
نظر فى سنة رسول الله فان وجد فيها ما يقضى به قضى به
فان اعياه ذلك فسأل الناس هل علمتم ان رسول الله قضى
فيه قضاء فربما قام اليه القوم فيقولون قض فيه بكذا وكذا

“হযরত আবু বক্‌র সিদ্দীক রা.-এর সামনে যখন কোনো আইনগত বিষয় আসতো তিনি প্রথমে কুরআন মজীদে তার সমাধান খুঁজতেন এবং যা সমাধান পেতেন তাই দিতেন। না পেলে (তাঁর জানা) সুন্নাতের দিকে মনোনিবেশ করতেন। সুন্নাতের কোনো সমাধান না পেলে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সিদ্ধান্ত কেউ জানে কি না? অনেক সময় সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বলে দিতেন এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।”[৩]

হযরত আবু বক্‌র রা. সুন্নাতের সন্ধান লাভে আনন্দিত হয়ে বলতেন।

الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا

'আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদের মধ্যে নবীর সুন্নাত সংরক্ষণকারী লোক বিদ্যমান রেখেছেন।'[৪]

হযরত উমর রা. একবার কুরআনের অর্থ অনুধাবন প্রসংগে সুন্নাতকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণকারীর ব্যাপারে বলেন:

سيأتى قوم يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله

'আগামীতে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে তোমাদের সাথে বির্তক করবে। তাদের কাছে সুন্নাতের প্রমাণ উপস্থিত করবে, কারণ সুন্নাতের বাহকেরা কুরআন সম্পর্কে বেশী জানে।[৫] হযরত উমর কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন:

انما ابعث ليبلغو نكم دينكم وسنة نبيكم او كما قال

'আমি শাসনকর্তা পাঠাই এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন ও তোমাদের নবীর সুন্নাত পৌছাবে অর্থাৎ সুন্নাত প্রচারও তাদের দায়িত্বভুক্ত।[৬] যমন তিনি সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দিয়ে বলেন :

ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا

'হে লোকেরা! তোমাদের জন্য রসূল স.-এর সুন্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। ফরযগুলো নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুস্পষ্ট চলার পথে যোদ্ধাদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি তোমরা লোকদের কথায় ডানে বাঁয়ে চলে গোমরাহ হয়ে যাও (তা তোমাদের ব্যাপার)।[৭]

অথচ হযরত উমর রা. এমন ব্যক্তিত্ব যিনি সুন্নাত থেকেও অগ্রসর হয়ে অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমল মুলতবী করে দিয়েছিলেন যাতে আম (عام) ব্যাপক হুকুম (خاص) খাস হুকুমে পরিণত হয়ে যায়, যথা– দুর্ভিক্ষ চলাকালে চোরের হাত কাটা মওকুফ করে ছিলেন এবং মুআল্লাফাতুল কুলূব তথা ইসলামে স্থিতি রাখবার জন্য যাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাকাত-সদকার মাল দিয়ে তাদেরকে যাকাত-সদকা দেয়ার ব্যাপারে বিদগ্ধ জনেরা পুরোপুরি অবগত আছেন। অন্যান্য সাহাবী এবং

তাবেঈগণও সুন্নাতের ব্যাপারে এই একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সুন্নাতের ধরণ, প্রকৃতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁরা আমাদের পথ নির্দেশক।

ফকীহ ইমামগণের দৃষ্টিভংগী

ফিক্‌হের ইমামগণও সুন্নাতের প্রতি একই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা র. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:-

لولا السنن مافهم احد منا القران

'সুন্নাত না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতোনা।'[৮]

নিম্নোক্ত বক্তব্যটি আরো বেশী সুস্পষ্ট :

لم تزل الناس فى صلاح مادام منهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا

"যতদিন মানুষ হাদীসের জ্ঞানান্বেষণ করবে ততদিন তারা সুকৃতির মধ্যে অবস্থান করবে। আর যখন তারা হাদীস ছাড়া জ্ঞান অর্জন করবে তখন বিকৃতির শিকার হবে।"[৯]

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন:

اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله (صلع) لم يحل له ان يدعها بقول احد

'মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যখন কারো কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ সালাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তখন তার জন্য অন্য কারো কথার ভিত্তিতে সে সুন্নাত পরিহার করা জায়েয হবে না।'[১০]

আল্লামা: সুয়ূতী র. ইমাম শাফেঈর র. নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেছেন সবই কুরআন থেকে গৃহীত।"[১১]

ইমাম মালেক র. বলেছেন :

كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم وافقه والسنة فاتركوه

'যা কিছু কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তা গ্রহণ করো। আর যা কিছু এ দুয়ের বিরোধী হয় তা প্রত্যাহার করো।'[১২]

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল র. বলেন:

من رد حديث رسول الله (صلم) فهو على شفا هلكة

যে ব্যক্তি রসূলের স. হাদীস প্রত্যাখ্যান করে সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে দুটি কথা জানা যায়:

এক. কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত প্রাথমিক গুরুত্বের অধিকারী।

দুই. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআনের পর সুন্নাত একটি উৎসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

সুন্নাতের ব্যাখ্যার কতিপয় ধরণ

নিচে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত ব্যাখ্যা সমূহের কতিপয় ধরণ পেশ করছি।

(১) কুরআন মজীদের যে আয়াতগুলো "মুজ্‌মাল" (সংক্ষিপ্ত) ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

(২) যে আয়াতগুলো "মুতলাক" (সর্বজনীন) ছিল পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলোকে "মুকাইয়েদ" (বিশেষিত ও নির্দিষ্ট) করেছেন।

(৩) যেগুলো কঠিন ছিল সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(৪) কুরআনের যে বিধানগুলো "মুজমাল" ছিল, অর্থাৎ যেগুলোর প্রায়োগিক অবস্থা, কারণসমূহ ও শর্তাবলী এবং অপরিহার্য বিষয়সমূহ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ছিল না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কাজেই নামায, যাকাত ইত্যাদি যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সুন্নাতে রয়েছে সেগুলো আসলে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যার ও তার বিশ্লেষণ।

(৫) কুরআনের ব্যাখ্যার আলোকে বহু উপস্থিত সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিধান তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব বিধান উল্লেখিত ছিল সেগুলোর উপর সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়সমূহ কিয়াস করেছেন। এগুলোর বিস্তারিত বিধান কুরআন মজীদে ছিলনা।

(৬) কুরআনী মূলনীতি ও উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রেখে উপায় উপকরণের বিধান বর্ণনা করেছেন।

(৭) কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে এমন সব মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যেগুলোর উপর নতুন অবস্থা ও সমস্যাবলী কিয়াস করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

(৮) কুরআনের বিধানের কারণ, হিকমত (তত্ত্বধর্মী উদ্দেশ্য) ও মাস্‌লিহাত (কল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য) বর্ণনা করেছেন। এগুলো থেকে বহুতর মূলনীতি ও পূর্ণাংগ নীতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

(৯) কুরআনের হেদায়েত থেকে উদ্দেশ্যাবলী উদ্ভাবন করেছেন। আবার তারই আলোকে শরীয়তকে মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে একাত্ম করেছেন।

(১০) সামগ্রিকভাবে এমন এক ধরণের জীবন যাপন করেছেন যা কুরআনী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাংঙ্গ ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে।

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

"কুরআনই তাঁর সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।"

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেমের বর্ণনা

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম-এর ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ

কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাতের অবস্থান সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়্যেমের দীর্ঘ বয়ানের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল :

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বর্ণনা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

এক. খোদ অহীর বর্ণনা সাহাবীদের কাছে যা অস্পষ্ট এবং অজানা থাকতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন।

দুই. তিনি অহীর অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। যেমন নিম্নোক্ত অয়াতগুলোতে এর নযীর মেলে:

وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيمَانَهُمْ بِظُلْم

"এবং যারা তাদের ঈমানের সাথে জুলুমের সংমিশ্রণ ঘটায় না" এই জুলুম-এর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন শির্‌ক।

يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

"(যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে) তার হিসাব হবে খুবই সহজ"- তিনি এই সহজ হিসাবের ব্যাখ্যা করেছেন "কেবল আল্লাহর আদালতে উপস্থাপন।"

حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاسْوَدَ

(রমযানের মাসে রাতে তোমরা পানাহার করো) "যতক্ষণ না কালো সূতার মধ্য থেকে সাদা সূতা তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।" তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: الخيط الابيض মানে সুবহে সাদিক, الخيط الاسود মানে সুবহে কাযিব

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

'তিনি (রসূল) তাঁহাকে (জিবরীলকে) দেখেছেন আরো একবার অবতরণে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার নিকট।' এখানে راه তে যে সর্বনাম (ه)-তার মানে জিবরীল।

اَوَ يَا تِىَ بَعْضُ ايٰتِ رَبِّكَ

"অথবা আসবে তোমার প্রতিপালকের بعض ايات অন্য কোন নিদর্শন" এই بعض ايات অর্থে, সূর্যের পশ্চিম আকাশে উদয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

'পবিত্র অর্থাৎ পূণ্যময় কথার উপমা হচ্ছে যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ।'

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الاٰخِرَةِ

"মুমিনদেরকে আল্লাহ অবিচল (স্থির) রাখবেন প্রতিষ্ঠিত কথার ওপর (ওয়াহ্‌দানিয়াতের উপর) দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে।'
হযরত স. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আখিরাতে قول ثابت-এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কবরে মানকির নাকীরের প্রশ্নের জবাবে মুমিনকে আল্লাহ স্থির অবিচল রাখবেন।
[رعد (Thunder) আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে]
তিনি বলেছেন, يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه একজন ফেরেশতা যিনি বরষা বাদলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

[তারা (ইয়াহুদী আর খৃষ্টান) গ্রহণ করেছে তাদের ধর্মগুরু আর সন্যাসীদেরকে ارباب(ب)-এর বহুবচন রূপে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদেরকে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত– এটাই হচ্ছে তাদেরকে ارباب রূপে গ্রহণ করার অর্থ।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

'তোমরা যত পার قوة (শক্তি) অর্জনের ব্যবস্থা করো তাদের (ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার) জন্য' রসূল (স) قوة এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'তীরান্দাজী' (তাঁর যুগে এটি ছিল শক্তি অর্জনের একটি মোক্ষম উপায়)।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ

'যে ব্যক্তি ঘৃণ্য (গুনাহর) কাজ করে তাকে তেমনি (ঘৃণ্য) প্রতিদান দেয়া হবে' তিনি বলেছেন এই جزاء বা প্রতিদানের অর্থ হচ্ছে কষ্ট, দুঃখ-শোক, ভীতি, রোগ ইত্যাদি যা দুনিয়ার জীবনে গুনাহ্গার ভোগ করবে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

'যারা উৎকৃষ্ট কর্ম করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পুরস্কার রয়েছে এবং রয়েছে অধিক কিছু'। আয়াতের "যিয়াদাহ" শব্দের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন 'আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাত'।

وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' আয়াতে দুআ دعاء শব্দের অর্থ তিনি করেছেন 'ইবাদত'। [এবং রাতের একাংশে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা (تسبيح) বর্ণনা করো এবং নক্ষত্ররাজির পশ্চাতে অস্তের পর] وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ

اِدْبَارَ النُّجُوْمِ তাসবীহের মানে তিনি বলেছেন, যুহরের নামাযের পূর্বে নামায।

আয়াতে দুই রাকআত وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ

এই আয়াতের اَدْبَارَ السُّجُوْدِ মানে মাগরিবের পরের দুই রাকা'ত নামায বলে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এগুলো ছাড়া আরো রসূল স.-এর ব্যাখ্যার বহু নযির পাওয়া যায়।

তিন, রসূলুল্লাহ স. নিজের কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন নামাযের সময় জানতে চাইলে নিজে যথা সময়ে তাকে নিয়ে নামায পড়ে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চার. কারো প্রশ্নের উত্তরে বিধান নাযিল হয়েছে, যেমন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করলো অথচ প্রয়োজনীয় চার জন সাক্ষী অথবা আদৌ কোন সাক্ষী হাযির করতে পারলোনা। সে জিজ্ঞেস করলো, এর বিধান কি? উত্তরে লিআন لعان সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো যাতে নির্দেশ রয়েছে, স্বামী চার বার হলফ করে বলবে তার অভিযোগ সত্য, পঞ্চম বারে আল্লাহর লা'নাত' কামনা করবে যদি অসত্য হয়। তদ্রুপ স্ত্রীও চার বার হলফ করবে এবং বলবে তার স্বামীর অভিযোগ অসত্য, পঞ্চম বারে লা'নাত' কামনা করবে যদি সত্য হয়– ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

...ীর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু সেই অহীর বাক্যগুলো কুরআনের ...। যেমন এক ব্যক্তি লম্বা জুব্বা পরে এবং বিস্তর খোশবু লাগিয়ে

হজ্জের ইহরাম বাঁধলো। জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত স. অহীপ্রাপ্ত হলেন এবং বললেন, সে যেন জুব্বা খুলে ফেলে এবং খোশবু ধুয়ে ফেলে।

ছয়. প্রশ্ন ছাড়াই তিনি বহু বিধান বর্ণনা করেছেন। যেমন গাধার গোশ্‌ত এবং মুত্‌আ (متعة) মেয়াদী বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন। মদীনায় শিকার হারাম ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে স্ত্রীরূপে ফুফীর বর্তমানে তার ভাইঝিকে এবং তদ্রূপ খালার বর্তমানে তার ভাগ্নীকে বিয়ে করা হারাম করেন।

সাত. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা করতে মানা করলেন না; সুতরাং কাজটি বৈধ গণ্য হলো।

আট. নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা শেখালেন। এতে বৈধতার এক ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেলো।

নয়. কোনো জিনিসের হারাম হবার ব্যাপারে নিরব থেকে তার মুবাহ مباح হবার বিষয়টির প্রতি অব্যক্ত ইংগিত দিলেন।

দশ. কুরআন মজীদ কোনো নির্দেশ দিল অথবা কোনো জিনিসকে হারাম বা মুবাহ ঘোষণা করলো, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাল, পাত্র ইত্যাদি সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করলো এমন সব ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত مجمل বিধান প্রদান করেন। বিস্তারিত مفصل বর্ণনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন, নিজের রসূলের ওপর। যেমন, وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ তোমাদের জন্য হালাল করা হল অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ ওরা ছাড়া অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত মেয়েরা ছাড়া। কুরআনে এই ماوراء ذلكم-এর সংশ্লিষ্ট বর্ণনা নেই। রসূলুল্লাহ স. তার বর্ণনা দিয়েছেন।

'আল্লামা শাতবীর বর্ণনা

এ সম্পর্কে নিম্নে 'আল্লামা শাতবীর বর্ণনার সার সংক্ষেপ দেয়া হলো : 'অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সুন্নাত কুরআন মজীদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুন্নাত কুরআন মজীদের অস্পষ্ট বচনের ব্যাখ্যা করে জটিল আয়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয় অথবা সংক্ষিপ্ত নির্দেশের ভাষ্য প্রদান করে। নিম্নোক্ত যুক্তিগুলোতে এর প্রমাণ মিলে:

সামগ্রিকভাবে সুন্নাত কুরআনের বায়ান বা ব্যাখ্যা যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ

'আমি তোমার কাছে যিকর [কুরআন] নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষের জন্য অবতীর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিতে পারো।' تبين শব্দে রসূলকে বর্ণনা করার দায়িত্ব অর্পনের কথা রয়েছে – এবং রসূলের বর্ণনাই সুন্নাত।

এসব জিনিস কুরআন মজীদ যে শরীয়তের পূর্ণাংগ বিধানের কিতাব তার উৎস এ কথা প্রমাণ করে, তা সবই নিজের অর্থ ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে সুন্নাতের কুরআন মজীদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হবার প্রমাণ।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে: وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(এবং তুমি (রসূল) সচ্চরিত্রের সুউচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত।)

হযরত আয়েশা রা. বলেছেন রসূলুল্লাহর স. "খুলুক" (চরিত্র)–এর অবয়ব হচ্ছে কুরআন। মানব চরিত্রের উপাদান হচ্ছে তাঁর কথা, কর্ম ও সমর্থন এবং সুন্নাত বলতেও এগুলোকেই বোঝায়। সুতরাং সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের 'বয়ান' এবং রসূল স. এর কথা, কর্ম ও সমর্থন যা কুরআন থেকেই উদ্ভূত।

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদকে تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ বলেছেন। এ কথার অনিবার্য পরিণতিতে সুন্নাতের সামগ্রিকভাবে কুরআন মজীদের অন্তরভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ "আমর" (আদেশ) ও "নাহী" (নিষেধ) প্রাথমিক ও মূলগতভাবে কুরআন মজীদ থেকে উদ্ভূত।

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

এখানে কুরআন নাযিল হবার কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থায় এই সামগ্রিক সুন্নাত হবে কুরআন মজীদে উল্লেখিত বিষয়সমূহের বর্ণনা। كتاب الا و لة এর প্রথমেই একথা এসেছে যে, সুন্নাত কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী অন্যথায় তা স্থগিত রাখা জরুরী।"[১৪]

মোটকথা সুন্নাত যে কুরআনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা তার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার বহু ধরণ ও পদ্ধতি রয়েছে। হাদীস সাহিত্যের বিশাল পরিসর থেকে তা বিস্তারিত জানা যেতে পারে।[১৫] আপাতদৃষ্টিতে হয়তো হযরত স.-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যার সূত্র কুরআন মজীদে পাওয়া যায়না। কিন্তু যে বিশেষজ্ঞরা ইসলামী শরীয়তে সামগ্রিক জ্ঞান রাখেন ও তার সার্বজনীন উদ্দেশ্যও লক্ষের সাথে পরিচিত, তাঁদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এসূত্র সহজেই ধরা পড়ে। এ ব্যাখ্যাগুলো মূলনীতি ও পূর্ণাংগ নীতি হোক বা সাময়িক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি হোক না কেন এদের কোনোটিরও ফায়দা অস্বীকার করা যেতে পারেনা। মূলনীতি ও পূর্ণাংগ নীতির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে সাময়িক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির সাহায্যে প্রমাণ উদ্ভাবন করার ধরণ জানা যায়।

আইন প্রণয়নে সুন্নাতের স্থান অনুধাবনের উপায়

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ভূমিকা জানার জন্য রসূল স.-এর যুগের অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। উক্ত অবস্থার আলোকেই উপলব্ধি করা যাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমসাময়িক সমাজের প্রচলিত রীতি রেওয়াজের কোন্‌টিকে কিভাবে এবং কতটুকু অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। সুন্নাতের মাধ্যমে আমরা অনেকাংশে তৎকালীন অবস্থাও অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজের বিস্তারিত অবয়ব জানা এবং সেই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ স. এর গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন ইত্যাদির যথার্থ সীমানা চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ফকীহগণের এ রীতি সম্পর্কে আলোচনা না করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের সময় ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়নি। ফকীহদের লেখায় এ ধরনের আলোচনা পাওয়া যায়না। যাহোক রসূলুল্লাহ স.-এর প্রবর্তিত শরীয়তের গুঢ় তত্ত্ব ও প্রকৃতি জানতে হলে তাতে তাঁর সুন্নাতের ভূমিকা আর সে সুন্নাতের প্রেক্ষাপটে আরব সমাজের অবস্থা জানা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ র.-এর কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"র একটি উধৃতি পূর্বে দেয়া হয়েছে। তাতেও তিনি এ কথাটিই গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। এতটুকু পথের দিশা পেতে পারি যার সাহায্যে এই কঠিন সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব নিম্নোক্ত রায় পেশ করেছেন :

ان كنت تريد النظر فى معانى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق اولا حال الاميين الذين بعث فيهم التى هى مادة شريعة وثانيا كيفية اصلاحه لها بالمقاصد المذكورة فى باب التشريع والتيسير واحكام الملة

"যদি তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের গভীরতা অনুধাবন করতে চাও তাহলে সর্ব প্রথম আরবের নিরক্ষরদের অবস্থা অনুসন্ধান করো,রসূলুল্লাহ স. আবির্ভূত হয়েছিলেন যাদের মধ্যে সেটাই তাঁর শরীয়তের মৌল উপরকরণ। এরপর তাঁর সংস্কারের ধরণ অনুধাবন করো। শরীয়ত গঠন, শরীয়তের বিধানকে সহজ করা, সমাজ বিধান সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মূল লক্ষ ছিল আরব জাতি। বিশ্বজনীন মূলনীতি ও পূর্ণাংগ নীতি প্রবর্তনে তাকেই ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই মূলনীতি ও পূর্বের নীতি সমূহকে কার্যকর রূপদান করার সময় এই

জাতির অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও বিবর্তন ইত্যাদির প্রতি নজর রাখা হয়েছে। বরং অনেকাংশে প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধানেরই আলোকে এই মূলনীতি সমূহের প্রবর্তন কার্যকর হয়েছে। এহেন অবস্থায় সমস্ত আকার-আকৃতিকে স্থায়ীভাবে আইনগত মর্যাদা দান করার প্রশ্নই দেখা দেয়না। আইন প্রণয়নের সময় আরবের রীতি-রেওয়াজ ও বিধানের আসল আকৃতি কি ছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে কি সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বর্জন করছিলেন তার একটি খতিয়ান সামনে রাখা গেলে যে কোনো পরিবর্তিত বা নতুন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

রসূলের উক্তিগুলোর প্রকারভেদ

রসূল স.-এর উক্তিগুলোকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক, যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে নবুওয়তের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُوا

অর্থাৎ রসূল স. তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো এই আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে উল্লেখিত প্রথম ভাগের অর্থাৎ 'আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, চরিত্র, নৈতিকতা, লেনদেন, পরকাল ইত্যাদির সাথে। সুতরাং এ সবের সাথে সম্পর্কিত উক্তি নবুওয়তের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত হলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। দুই, নবুওয়তের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে যে সব উক্তির সম্পর্ক নেই বরং যে উক্তি কোন পরামর্শ বা মতামত ভিত্তিক, যেমন تابير النخل (পুং জাতীয় খেজুরের ফুলের রেনু স্ত্রী জাতীয় খেজুর ফুলে ছড়ানো অর্থাৎ পরাগায়ন) সম্পর্কে হযরত স. এর বিরূপ মন্তব্যের দরুন সাহাবাগণ ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ করলেন, পরিনামে ফলন কম হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ স. বলেন:-

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوه واذا امرتكم بشئ من رائى فانَما انا بشر -

'আমি একজন মানুষ মাত্র। যখন তোমাদের দীনের ব্যাপারে আমি কোনো হুকুম দেই তখন তা গ্রহণ করো এবং যখন নিজ মতের ভিত্তিতে কোনো হুকুম দেই (তা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, কারণ) আমি একজন মানুষইতো (ভুলভ্রান্তি হতে পারে)। এই শ্রেণীর উক্তির মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর উক্তির মতো হতে পারেনা। পরামর্শ ও মতামত ভ্রমাত্মক হতে পারে। যেমন বদর -এর যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে

মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল পরামর্শক্রমে কিন্তু আল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশের সাথে অনুমোদন দান করলেন। অবস্থা ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে মানবিক দুর্বলতা প্রসূত হতে পারে। (অবশ্য নবী রসূলের ভুল ভ্রান্তি নিবারণ বা সংশোধনের ব্যবস্থাও আল্লাহ রেখেছেন যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তি বা বয়ান বা ফয়সালার সম্পর্ক সাধারণত থাকে নিম্নরূপ ব্যাপারগুলোর সাথে :

এক. প্রয়োজনে সামরিক বা রাজনৈতিক যে ফয়সালা দেয়া হয়।

দুই. যে সব ফয়সালা পদ্ধতিগত এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বদলে যেতে থাকে। যেমন, যুদ্ধ কৌশল, রাষ্ট্রের কোন বিভাগের বিন্যাস ইত্যাদি।

তিন. ব্যক্তি জাতি বা দেশভিত্তিক আচরণ বা রীতি সম্বন্ধে ফয়সালা।

চার. যেসব কথা আরবে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ স. গল্প বলার স্বাভাবিক প্রবণতা বশত কিংবা কারো চারিত্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

পাঁচ. 'আরবদের কোন কোন অভিজ্ঞতা যথা চিকিৎসা, কৃষি ও বাগান রচনা সম্পর্কে তিনি যা বর্ণনা করেছেন।

একজন আইন প্রনেতার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর উভয় ধরনের উক্তি ব্যাখ্যা বা ফয়সালার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অন্যথায় আইন তার বাস্তব কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে যে-সব ক্ষেত্রে অবস্থা ও যুগের তাগিদ অনুযায়ী আইনের বিন্যাস করতে হয়।

সুন্নাত সম্পর্কে ইমাম আবুহানীফার র. বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইমাম আবু হানীফা (শ্রেষ্ঠ এক আইন প্রণেতা) সম্পর্কে এ কথাটি প্রচলিত যে, তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নতের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখেননি। কথাটি সত্য নয়। এতে যদি কিছু সত্যতা থাকে তবে তা হযরত স.-এর উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তি বা ফয়সালার প্রেক্ষিতে। ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে যত বেশী সামঞ্জস্যশীল হতে পেরেছে অন্য কোনো ইমামের ফিকাহর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। হানাফী ফিকাহর অধিকতর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই সামঞ্জস্যশীলতা। একদিকে ইসলামী আইনের সর্বব্যাপকতার এবং অন্যদিকে রসূলুল্লাহর স. বাণীসমূহের ধরন ও স্বরূপ অনুধাবন করলে অনিবার্যভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, আইনের জগতে কিয়াস ও রায়-এর গুরুত্ব কম নয়। অথচ এই কিয়াস ও রায় অধিকতর প্রয়োগের কারণে ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে অভিযুক্ত করা হয়।

আইন প্রণয়নে (ফিকাহ) সুন্নাত সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ফকীহগণ আইন প্রণয়নের জন্য সুন্নাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করেছেন :

১. নাসেখ ও মান্‌সূখ

২. মুজ্‌মাল ও মুফাস্‌সাল

৩. খাস ও আম

৪. মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ

৫. বিধান সমূহের শ্রেণী ও মর্যাদা (যেমন ওয়াজিব, সুন্নাত, মুবাহ্ ইত্যাদি)

কুরআন মজীদ থেকে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহের যে পদ্ধতি ও মূলনীতি ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যেও উপরোক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য, তদ্রূপ সুন্নাতের ক্ষেত্রেও সে সবের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অধিকন্তু রেওয়ায়েত (বর্ণনা প্রক্রিয়া) ও দেরায়েতের (دراية যুক্তি প্রয়োগে বিশ্লেষণ) বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক হাদীস সনাক্ত করার কাজটি বিস্তর অনুসন্ধান স্বাপেক্ষ এবং বিপুল গুরুত্বের দাবীদার। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সাথে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে সুন্নাতের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণের কাজও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য, কুরআন ও সুন্নাতের যে অংশ ঘটনাবলী ও ওয়াজ নসিহতের সাথে সম্পর্কিত, কতিপয় ফকীহের মতে আইন প্রণয়নের জন্য সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করার এবং সেই দৃষ্টিতে আইনের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার, উপরন্তু আইনকে ফলপ্রসূ করার জন্য উক্ত প্রকার আয়াত ও হাদীসে অনেক পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদি তাকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে, তাহলে তার মধ্যে রসহীনতা ও কর্কশ ভাব দেখা দেবে। ইসলামী আইনের প্রাণ যে অন্তরংগতা, স্নেহ ও ভালোবাসা, তা সেখানে কমে যাবে।

হাদীস সংকলনে সতর্কতা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর বহুকাল যাবত (প্রায় একশ বছর) হাদীস সংকলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি যদিও হাদীসের চর্চা হতো যখনই কোন উদ্ভূত সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন পড়তো। অথবা সাহাবাগণ কাউকে নেক কাজের উৎসাহ দান এবং কোন বদ কর্মের প্রতিরোধের ...হাদীসের ব্যবহার করতেন। চর্চা যথেষ্ট হলেও বহুদিন যাবত হাদীসের ...বং গ্রন্থায়ন সত্বেও হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে এত বেশী সতর্কতা ...নি। অন্যপক্ষে, ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা ইসলামী সমাজে বিভ্রান্তি

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে জাল (বানোয়াট) হাদীস প্রচার হতে শুরু করে। কোন কোন বর্ণনাকারী সদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোন সৎকাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করেন।

পরবর্তী কালে যখন হাদীসের সংগ্রহ শুরু হলো, তখন আসল আর নকল হাদীস যাচাই করার জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কতকগুলো মানদণ্ড উদ্ভাবন করলেন যা উসূলুল- হাদীস নামে ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য রাবী (বর্ণনাকারী) দের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের গরজে তাঁদের জীবনী সংগ্রহ কর হলো, তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করা হলো। তাতে সৃষ্টি হলো ইসলামী জ্ঞানের আরো একটি শাখা যার নাম হচ্ছে "আসমাউর রিজালিল হাদীস" অর্থাৎ হাদীস বর্ণনা কারীদের নাম, সংক্ষেপে "রিজাল" (رجال)। এতে লক্ষ লক্ষ রাবী-র জীবনী সংগৃহীত হলো। এভাবে হাসীদের বিচার করা হলো। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি বলছেন তিনি অমুকের কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন কিন্তু দেখা গেল এই ব্যক্তির জন্মের পূর্বে সেই অমুক মারা গেছেন বা প্রমানিত হলো তাদের দুজনার সাক্ষাতই ঘটেনি। তাহলে হাদীসটি সত্য হতে পারেনা– রেওয়ায়েতের দিক থেকে। তারপর দিরায়াতের দিক থেকে বিচার হবে। দিরায়াতের মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ।– হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে:– যদি

১. হাদীসটি কুরআন মজীদের কোন নীতি বা হুকুম-এর বিরোধী না হয়;
২. বাস্তব ঘটনাবলী ও চাক্ষুষভাবে দৃষ্ট অবস্থার বিপরীত না হয়;
৩. সর্বসম্মত মূলনীতির বিরোধী না হয়;
৪. যদি কোন মুতাওয়াতির[১৬] হাদীস ও সাহাবীগণের কার্যক্রমের বিরোধী না হয়;
৫. قلب سليم অর্থাৎ সুস্থ সত্যাশ্রয়ী হৃদয়জাত বুদ্ধির বিপরীত না হয়;
৬. তাতে সংস্কারপ্রীতি ও অলীক কল্পনার প্রশ্রয়মূলক ভাবধারা না থাকে;
৭. তাতে খুবই মামুলি বা তুচ্ছ ব্যাপারে সুকঠিন 'আযাবের কথা না থাকে অথবা মামুলী ধরনের সৎকাজের জন্য ব্যাপক পুরস্কারের কথা না থাকে;
৮. হাদীসটির বর্ণনায় এমন গূঢ় কিছু না থাকে যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলেনা;
৯. তাতে কারো মর্যাদা (مناقب) ও শ্রেষ্ঠত্ব (فضائل) বর্ণনায় বাড়াবাড়ি (غلو) না থাকে;
১০. যদি তাতে কারো এমন ধরনের দোষের বর্ণনা না থাকে যা কোন মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়না;
১১. যদি তাতে এমন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী না থাকে যাতে নির্ধারিত ব... উল্লেখ রয়েছে।

১২. যদি হাদীসের বর্ণনায় ব্যবহৃত বাক্যগুলো আরবী ব্যাকরীতি ও ব্যাকরণের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়;

১৩. হাসীসের অর্থ ও তাৎপর্য নবুওয়তের মর্যাদার বিরোধী না হয়।[১৭]

মুহাদ্দিসগণ উক্ত মানদণ্ডগুলো সামনে রেখে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থাদিতে হাদীসের جرح و تعديل (সমালোচনা ও সত্যতা নির্ধারণ)-এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। কতিপয় মুহাদ্দিস বানোয়াট ও জাল হাদীসের সংকলন রচনা করেছেন। এ জাতের সংকলনসমূহে নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

كل حديث رايته يُخَالف العقولَ او ينُاقض الاصولَ فَاعلم انه موضوع فلا يتكلف اعتباره اى لا تعتبر روايته ولا تنتظرفى جرحهم او يكون ممايدفع الحس المشاهدةُ او مبائن لنص الكتاب او السنة المتواترة اوالاجماع القطعى حيث لايقبل شئ من ذلك التاويل

“সুস্থ বুদ্ধির খেলাফ ও উসূল বিরোধী হাদীসকে বানোয়াট তথা জাল হাদীস মনে করতে হবে। তার রাবীদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যাবে না। এমন হাদীসের বিচার বিশ্লেষণেরও কোন দায়িত্ব নেই। নির্দ্বিধায় তাকে দোষদুষ্ট বলে পরিত্যাগ করতে হবে অথবা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও অবস্থা বর্ণিত হাদীসকে রদ করে দেয় কিংবা তা আল্লাহ্‌র কিতাব, রসূলুল্লাহ স. -এর মুতাওয়াতির সুন্নাত ও চূড়ান্ত ‘ইজমা’-এর বিরোধী প্রমাণিত হয়। এসব দোষে দুষ্ট হাদীস সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা গৃহীত হবে না ।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, সুস্থ বুদ্ধি এবং দিরায়াতের মানদণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সব হাদীস সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে যাতে সাধারণ ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু যেসব রেওয়ায়াত অদৃশ্য জগতের এবং বুদ্ধির অগম্য কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোতে বুদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দিলে অন্যতর বিপদের আশংকা বেড়ে যাবে।

মোট কথা, হাদীস বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাই করার জন্য হাসীদের বিশেষজ্ঞগণ যেসব মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অধ্যয়ন করার পর একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে হাদীসকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ থাকে না।

হাদীসের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবীগণের জীবনের গুরুত্ব

হাদীসের স্থান নির্দেশ করার জন্য রসূলের স. সাহাবীগণের জীবন বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। ফকীহগণ এ থেকে সাহায্য লাভ করেছেন। তাঁদের আমল ও

ব্যাখ্যামূলক বর্ণনাকে ফকীহগণ দলীল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাহাবা রা. এবং তাঁদের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের ইরশাদ ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী (সর্ব প্রথম ঈমান এনেছে) এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আর আল্লাহ তাদের জন্য চিরন্তন নিয়ামতের জান্নাতসমূহ তৈরী রেখেছেন, যাদের নিম্নদেশ থেকে নদী প্রবাহিত। তারা চিরকাল এই নিয়ামত ও আনন্দময় জীবনে অবস্থান করবে। এটি অনেক বড় সাফল্য।"

আয়াতে وَالسّٰبِقُوْنَ الاَوَّلُوْنَ (অগ্রগামী, সর্বপ্রথম ঈমান আনেন যাঁরা) এবং اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ (যাঁরা তাদের অনুসরন করেন) বলে যে দুটি দলের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে

প্রথম দলটি কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে নববীর স্থান নির্ধারণ করে এ দুটির আলোকে আইন রচনা করেছেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রথম শ্রেণী ছিল এই দলের কেন্দ্রীয় শ্রেণী।

এরপর দ্বিতীয় দলটির স্থান। তারা নিষ্ঠা ও সততার সাথে এমনভাবে প্রথম দলটির অনুসরণ করেন যে, যা কিছু তাঁরা স্থির করে দিয়েছিলেন তাকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাকে দলীল হিসেবেও ব্যবহার করেন।

এই উভয় দলের জন্য رضى الله عنهم ورضوا.عنه বাক্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল এবং অনেক বড় গ্যারান্টি। বিশেষ করে ورضوا عنه তাঁদের প্রকৃতি ও আল্লাহর আইনের প্রকৃতির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যের দলীল রয়েছে। اتبعوهم باحسان (নিষ্ঠা সহকারে যারা অনুসরণ করেছে) এই শ্রেণীতে তাঁরাই গণ্য হবেন যাঁরা রসূলের সাহাবীগণের জীবনকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেবেন এবং আইন প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের আলোকবর্তিকার সাহায্য নেবেন। এরি ভিত্তিতে ফকীহগণ সাহাবীগণের কথা ও কর্মকে "সুন্নাত" এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উসূলে ফিকহের কিতাবগুলোতে সাহাবীগণের সম্পর্কে ফকীহদের এই অভিমত উল্লেখিত হয়েছে;

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم

"যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সাহাবীগণ সে সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করেন এবং মেনে নেন, তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মত ভাবে اجماعا ওয়াজিব। আর যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ প্রমাণিত হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব নয়।"[১৯] কেন মেনে নিতে হবে তার কারণ নিম্নরূপ ঃ

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة و ان اجتهدوا فرأيهم اصوب لا نهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم فى الدين وبركة صحبة النبى صلى الله عليه و سلم وكونهم فى خيرالقرون -

"কারণ তাঁদের অধিকাংশ কথা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শ্রুত। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ করেন তাহলে তাদের রায় সব চাইতে প্রকৃষ্ট অবতরণের কারণ, তাঁরা কুরআন মজীদের বাক্যসমূহের (نص বহুবচন نصوص স্পষ্ট ও অবিসম্বাদিত বাক্য) স্থান কাল সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈমানে তাঁরা অগ্রবর্তী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাঁরা ধন্য। তাঁদের যুগ ছিল "খায়রুল-কুরুন" তথা সর্বোত্তম যুগ।"

لا نهم شاهروا احوال التنزيل واسرار الشريعة ومعرفة اسباب التنزيل

"কারণ তাঁরা (সাহাবাগণ) কুরআন অবতরণের অবস্থা ও দৃশ্যপট প্রত্যক্ষ করেছেন, শরীয়তের গূঢ় রহস্য সমূহ সরাসরি রসূল স.-এর কাছ থেকে জেনেছেন অহী নাযিলের কার্যকারণগুলোর গভীর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন।[২০]

এসব কারণে তাঁরা কোনো কথা নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে বললেও অন্যদের কথার তুলনায় তা অনেক বেশী গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবার পরও ফকীহগণ স্থান-কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁদের মতে, সাহাবীদের রায় যদি এমন পর্যায়ের হয় যেখানে কিয়াস করার কোনো অবকাশ থাকেনা, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ ওয়াজিব, যদি কিয়াসের অবকাশ থাকে তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিয়াস করা যেতে পারে।"[২১]

অবশ্য সব মানুষ যেমন সমান হয়না সব সাহাবীও সমান ছিলেন না। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, আমানতদারী-বিশ্বস্ততা, তাকওয়া এবং রসূল স.-এর সাহচর্য ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কাজেই তাঁদের অনুসরণ এবং তাঁদের কথা ও কর্মের স্থান-মর্যাদা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে।

অনুবাদ ঃ **আবদুল মান্নান তালিব**

গ্রন্থপঞ্জি

১. নূরুল আন্ওয়ার ইত্যাদি

২. নূরুল আন্ওয়ার ইত্যাদি

৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১৪৮ পৃ. এবং আলামুল মুকিঈন প্রথম খণ্ড ২২ পৃ.।

৪. ঐ (প্রথমোক্ত) ১৪৭ পৃ. এবং তারীখুল খুলাফা।

৫. মুকাদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী কানূন নম্বর ১ম খণ্ড থেকে, ৩০৫ পৃ.

৬. আলামু'ল মুকি'ঈন, ১ম খণ্ড,

৭. আল-ইতিসাম, ১ম খণ্ড, ইসলামী কানূন নম্বর ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৮. মুকাদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী আইন নম্বর ৩০৮ পৃষ্ঠা।

৯. মুকাদ্দমাতুল মীযান, ইস্লামী কানূন নম্বর, ৩০৮ পৃষ্ঠা।

১০. আলামু'ল মুকি'ঈন ২য় খণ্ড।

১১. আল-ইত্কান

১২. জামে আহলিল 'ইলম, ইসলামী কানূন

১৩. কিতাবুল মানাকিব, ইবনূ'ল জাওযী

১৪. মুকাদ্দমা ফতহুল মুলহিম, ২১ পৃষ্ঠা

১৫. হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ও সুন্নাতের (কুরআনের) ব্যাখ্যা ও বর্ণনা হবার ব্যাপারে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের আলোচনা করেছেন। বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। দেখুন হুজ্জতুল্লাহিল বালিগাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা

১৬. মুতাওয়াতির সেই সহী হাদীস যা প্রতি যুগে ও প্রতিটি স্তরে এত বেশী সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে তাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী করার জন্য দলবদ্ধ হওয়া অকল্পণীয়– অনুবাদক

১৭. 'ইজালা-ই-নাফে'আ এবং মুকাদ্দমা ফত্হুল মুল্হিম, পৃষ্ঠা ১৬ ইত্যাদি।

১৮. মুকাদ্দমা ফত্হুল মুল্হিম ১৬ পৃষ্ঠা, "তাযকিরা তু'ল মওদু' লি ইবনি'ল জাওযী"

১৯. তাওযীহ তাল্বীহ, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা

২০. তাওযীহ তাল্বীহ, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা

২১. হুসমী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন : ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা : ২৯-৬৬

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ অনুষঙ্গ ও তার ইসলামী বিধান

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

Abstract

At present, to sell by installment is one of the most important aspects of banking system. There is a huge scope for investment by installments in Islamic Banking system. This system is known in the field of Islamic Banking as 'Higher purchase under shirkatul milk' (HPSM), 'Ijaara bil bai' (IBB), 'Al-Ijara Al-Muntahia bittamlik' (IMT) etc. This is similar with Fiqhi term 'Bai Muajjal'. In this article efforts have been made to discuss about various aspects of shariah as far as sale of things by installments is concerned especially obligations and rights of buyer with installment. So this article is a guideline for who will practice in this field.

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ অনুষঙ্গ ও তার ইসলামী বিধান

অর্থনৈতিক জীবনে সব মানুষের অবস্থান একই মেরুতে নয়। অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল মানুষের বিলাস জীবনের চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তর করার প্রয়াসে অথবা কখনো কখনো বেঁচে থাকার তাগিদে 'বিক্রেতার মুনাফা অর্জন ও ক্রেতার প্রয়োজন পূরণ' এই মূলনীতির ভিত্তিতে যুগ পরিক্রমায় ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পথ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মানবতার শ্রেষ্ঠতম জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম জীবনের নানা অনুষঙ্গে কল্যাণমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা; যার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি গতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই নীতিমালার অন্যতম বিষয় হলো- বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী' বৈধতার উপর ভিত্তি করে কিস্তিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান নিরূপণ করা হয়ে থাকে। কিস্তিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বর্তমান সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাণিজ্যিক

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা।

কোম্পানি, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এক বিশাল পরিসর রয়েছে কিস্তিতে বিনিয়োগ নিয়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' (HPSM) এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কোন কোন ব্যাংক এ পদ্ধতিকে 'ইজারা বিল বাই' (IBB) নামে অভিহিত করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতি 'আল-ইজারা আল মুনতাহিয়াতু বিত্ তামলীক' (IMT) হিসেবে পরিচিত।[১] এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল নীতির আলোকে কিস্তিভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ করে থাকে। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা কিস্তিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

কিস্তিতে মালামাল বিক্রয় বলতে কী বুঝায়?

কিস্তিতে বিক্রয় বলতে বুঝায়, বিক্রেতা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত সময়, কিস্তি ও মূল্যের ভিত্তিতে কোন দ্রব্য বাকিতে বিক্রয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: 'ক' (বিক্রেতা) একটি মোটর সাইকেল নির্ধারিত মূল্য ১,২০,০০০/- টাকায় দুই বছরের মধ্যে মাসিক ৫,০০০ টাকার ২৪ কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে 'খ' (ক্রেতা) এর কাছে বিক্রয় করল। এ জাতীয় বিক্রয়ের মধ্যে সাধারণত: ৪টি শর্ত পরিলক্ষিত হয়:

ক) মূল্য পরিশোধের সময়

খ) দ্রব্যের মূল্য

গ) কিস্তি সংখ্যা ও

ঘ) কিস্তির পরিমাণ।

বিক্রয়ের দুটি ধরন

সাধারণত: মালামাল বিক্রয়ের দুটি ধরণ হয়ে থাকে: ১) বিক্রেতা নগদ বিক্রয় ও বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে তথা বাকিতে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যের একই মূল্য নির্ধারণ করে। এ জাতীয় বিক্রয়ে শরয়ী কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ২) বিক্রেতা দ্রব্যের দুই ধরনের মূল্য নির্ধারণ করে, নগদ বিক্রয়ের জন্য একটি আর বাকি তথা কিস্তিতে বিক্রয়ের জন্য অন্য একটি। বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য উতূল হতে বিলম্ব হয় বিধায় নগদ মূল্যের চেয়ে দ্রব্যমূল্য বেশি নির্ধারণ করা হয়। এ দ্বিতীয় ধরনের বিক্রয়ের শরয়ী বিধান নির্ণয়ই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

দ্রব্যমূল্য বা ঋণ বিলম্বে পরিশোধ করার বিধান

ঋণ মূলত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা আবশ্যক। তবে ঋণদাতা সম্মত হলে ঋণ পরিশোধের সময়কে বিলম্বিত করা বৈধ। ইসলামী ফিক্হ বিশেষজ্ঞগণ ঋণ বিলম্বে পরিশোধ বৈধ হওয়ার বিষয়ে একমত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ বৈধতা প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ....

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।"[২]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোন কোন সময় ঋণ বিলম্বে পরিশোধের বৈধতা রয়েছে এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখাটা উত্তম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লামা আইনী বলেন: "আলিমগণ এ আয়াতের ভিত্তিতে একমত যে, বাকিতে মালামাল বিক্রয় জায়েয।[৩]

সুন্নতে নববী থেকেও এর প্রমাণ মেলে। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইয়াহুদী থেকে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।[৪] হাদীসটি বন্ধক রাখা ও আহলে কিতাবের সাথে বেচাকেনার বৈধতার পাশাপাশি ঋণ (বিক্রয়মূল্য) বিলম্বে পরিশোধের বৈধতার ইংগিতও প্রদান করে। একইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জাবের রা. থেকে কূপ ক্রয়ের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবের রা. থেকে বাকিতে কূপ ক্রয় করেন এবং মদীনায় ফেরার পর তার মূল্য পরিশোধ করেন।[৫]

মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে অদ্যবধি এই পদ্ধতি গ্রহণ করে আসছে, কেউ এর বিপরীতে কোন দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেননি বিধায় এটি ইজমায়ে উম্মাহ সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী ইবনু বাত্তাল থেকে এ ইজমার বর্ণনা দিয়েছেন।[৬]

ঋণ বিলম্বে পরিশোধের বৈধতার পিছনে হিকমত হলো, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তাৎক্ষণিক ঋণ পরিশোধের আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন; যাতে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যকার চুক্তির মেয়াদের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তার ঋণের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আর এ কারণে বাকিতে মালামাল বেচাকেনার মধ্যে বরকতের ঘোষণা এসেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ثلاثة فيهن البركة : البيع إلى اجل
"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে, বাকিতে বেচাকেনা।"[৭]

ঋণ বা দ্রব্যমূল্য কিস্তিতে পরিশোধের বিধান

ঋণ বা দ্রব্যমূল্য কিস্তিতে পরিশোধ বৈধ কি না তা মূলত: ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও ঐকমত্যের উপর নির্ভর করে। যদি ক্রেতা-বিক্রেতা বা চুক্তি

সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এমন বিষয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একমত হন তবে তা বৈধ হবে। এর দলিল হিসেবে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ করতে পারি, তিনি বলেন:

المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا

"মুসলমানদের চুক্তিগুলো অবশ্য পালনীয়, তবে ঐ চুক্তি ব্যতীত যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে।"[৮]

কিস্তিতে মালামাল বিক্রয় একটি আধুনিক পরিভাষা হওয়ায় ফিক্‌হের কিতাবে সরাসরি এ সম্পর্কিত কোন বিধান পাওয়া যায় না। তবে ইব্‌ন আবিদীন র. তাঁর হাশীয়াহতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন:[৯]

ومنها – أي جهالة الأجل – اشترط أن يعطيه الثمن على التفريق أو كل أسبوع البعض، فإن لم يشترط فى البيع بل ذكر بعده لم يفسد وكان له أخذ الكل جملة

তাছাড়া ঋণ বা দ্রব্যের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের বিষয়ে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা বা সংশয় বর্তমান নেই; বরং এটি এমন একটি বিধান যার মাধ্যমে একজন মুসলিম ঋণ গ্রহীতা বা ক্রেতা আর্থিক দিক থেকে সুবিধা হাসিল করেন।[১০] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء سمح القضاء

"মহান আল্লাহ বিক্রয়, ক্রয় ও পরিশোধে ঔদার্য্য বা উদারতা ভালবাসেন।"[১১]

উপরন্তু কিস্তিতে বেচাকেনার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই কল্যাণ নিহিত। বিক্রেতার কল্যাণ হল সহজলভ্য করায় সে তার পণ্য বেশি বিক্রয় করতে পারে। কিস্তিতে বিক্রয়কে একটি ব্যবসায়িক পদ্ধতি (Business Policy) গণনা করে নগদ বেচাকেনাও করে আবার কিস্তিতে বেচাকেনাও করে। কিস্তিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য গ্রহণ করে। আর ক্রেতার উপকারিতা হল সে অল্প পুঁজির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করে। ঋণ পরিশোধের আগেই পণ্য ব্যবহারের অনুমতি পায়। অথচ নগদ মূল্যে কিনতে হলে তাকে আগে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা করে কিনতে হত।

বিলম্বে বা কিস্তিতে পরিশোধের কারণে দ্রব্যমূল্যের নগদ দামের চেয়ে বেশি মূল্য গ্রহণ

সালফে সালেহীন ও সমসাময়িক আলেমগণ এ প্রশ্নে দুটি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম মত: বিলম্বে মূল্য পরিশোধের কারণে দ্রব্যমূল্য নগদ দামের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করা বৈধ। এ মতের পক্ষে রয়েছেন- চার মাযহাবের জমহুর ফকীহ, সালফে সালেহীনের এক বিরাট অংশ। ইব্‌ন কুদামাহ বলেন: কেউ যদি বেচাকেনার সময় বলে, নগদ কিনলে এই দাম আর বাকিতে কিনলে এই দাম তবে কোন দোষ নেই।[১২]

এ মতের দলিল

১. মহান আল্লাহর বাণী: وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ।"[১৩] এ আয়াতটি ব্যবসার মৌলিক নীতি সম্বলিত। যে ব্যবসায় শরীয়ত পরিপন্থি কোন বিধান পাওয়া যায় না বা সুদের কোন ছোয়া থাকে না সেসব ব্যবসাকে মহান আল্লাহ বৈধ বলেছেন।

২. মহান আল্লাহর বাণী:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مِّنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পর সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।"[১৪] তারা বলেন: বাকীতে বিক্রয় ব্যবসার অন্যতম একটি পদ্ধতি। এর ফলাফলও ব্যবসায়িক সীমারেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুদের মধ্যে নয়।[১৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ঋণের লেনদেন করবে তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।"[১৬] অতএব যদি এ আয়াতের আলোকে কিস্তির পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত ও জ্ঞাত হয় তবে কিস্তিতে বেচাকেনার মধ্যে কোন অসুবিধা থাকে না।

৪. আয়িশা রা. বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, বারীরা এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতি বছর এক আউকিয়াহ করে নয় আউকিয়া প্রদানের (মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার জন্য) চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। অতএব আমাকে সহযোগিতা করুন।[১৭] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ বিন বা'য বলেন: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বারীরা রা. এর ঘটনা প্রমাণ করে যে তিনি নিজেকে তার মনিব থেকে প্রতি বছরে এক আওকিয়া করে নয় বছর মেয়াদে নয় আওকিয়ার বিনিময়ে নিজেকে কিনে নিয়েছিলেন। আর এটিই "বাঈ তাকসীত" বা কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি বরং স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ পদ্ধতির নিষেধজ্ঞাও দেননি।[১৮]

দ্বিতীয় মত: এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। কেননা এ পদ্ধতিতে সময়ের বিপরীতে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। যা সুদ বা সুদ সদৃশ। এ মত ব্যক্তকারীদের অন্যতম যাইনুল আবিদীন ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, হাদুয়াই এর আল-নাসির ও আল-মানসূর এবং ইমাম ইয়াহইয়া এর মত। অনুরূপভাবে এটি ইমাম জাস্সাস ও সমসাময়িক একদল আলেমের মতও।[১৯]

তাদের দলীল

১. মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ।"[২০] এ আয়াতটি সময়ের বিপরীতে গৃহীত অতিরিক্ত মূল্য যা সুদের পর্যায়ভুক্ত তাকে হারাম ঘোষণা করে। তাছাড়া আল্লাহর বাণী: "কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পর সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।"[২১] যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে। সুদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সন্তুষ্টি থাকলেও তা হারাম।

২. এ পদ্ধতিতে এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই ধরনের শর্ত থাকে। যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর রা. থেকে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لا يحل سلف وبيع ولاشرطان فى بيع ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك

"অগ্রিম নিয়ে বেচাকেনা, এক বেচাকেনায় দুই ধরনের শর্ত, সংশ্লিষ্ট নয় এমন মুনাফা এবং যা তোমার কাছে বর্তমান নেই তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।"[২২]

৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম بيعتين فى بيعة "এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়" থেকে নিষেধ করেছেন।[২৩] আর কিস্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত এ পদ্ধতির অন্যতম। কেননা এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা বলে-আমি এ পণ্যটি নগদে এক হাজার টাকায় অথবা বাকিতে দেড় হাজার টাকায় বিক্রি করছি।

৪. কর্জ পরিশোধের সময় বৃদ্ধির বিপরীতে বাড়তি অর্থ গ্রহণ ও দ্রব্যমূল্য পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির বিপরীতে বেশি মূল্য গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ই সুদ।[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে এর হুকুমেও ভিন্নতা রয়েছে:

প্রথম পদ্ধতি: কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই নগদ মূল্য দেয়ার শর্তে বিক্রয় সম্পাদিত হয়, অতঃপর উভয়পক্ষ একমত হয় যে, বিক্রেতা যদি অর্থ গ্রহণে বিলম্ব করে তবে তার প্রাপ্য অর্থে বাড়তি প্রদান করা হবে। কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়া এ জাতীয় বাড়তি সেই জাহেলী যুগের চিরচেনা সুদের নামান্তর "আমাকে পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দাও আমি তোমার অর্থ বাড়িয়ে দেব"।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: এই মর্মে বিক্রয় সম্পাদিত হবে যে, ক্রেতা নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় করলে কম মূল্যে আর বাকিতে বা কিস্তিতে ক্রয় করলে বেশী মূল্যে। মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করার কারণে বাড়তি দাম প্রদান করতে হবে। কিন্তু ক্রেতা ক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে সে কোন পদ্ধতিতে (নগদ/ বাকি) মূল্য পরিশোধ করবে তা নির্ধারণ করে না, অর্থাৎ নগদ কিনবে না কি বাকিতে? এমতাবস্থায় বিক্রয় মূল্য অস্পষ্ট হওয়ায় এ জাতীয় বিক্রয় বৈধ হবে না। কেননা ক্রেতা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে দুটি অপশনের কোনটিকে নির্ধারণ করেনি।

তৃতীয় পদ্ধতি: ইসলামী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতিতে লেনদেন করছে। বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন যে, পণ্য নগদ মূল্যে কিনলে এক হাজার আর বাকিতে বা কিস্তিতে কিনলে দেড় হাজার। অতঃপর ক্রেতা দুটি অপশনের যে কোন একটি নির্ধারণ করবেন এবং বিক্রেতার সাথে ঐকমত্য স্থাপন করবেন। অতঃপর তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে। ক্রেতা নগদ মূল্যে ক্রয় করলে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ করবেন আর বাকিতে বা কিস্তিতে ক্রয় করলে কিস্তির সময়কাল, কিস্তি সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।[২৫]

কিস্তিতে মালামাল বিক্রয় চুক্তির ফিকহী নীতিমালা

কিস্তিতে মালামাল বিক্রয়ের এ ব্যবসা ইসলামের দৃষ্টিতে সহীহ্ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যে নীতিমালা উল্লেখ করেছেন নিম্নে তার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

* ক্রেতার শিষ্টাচার

কিস্তিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতার কিছু শিষ্টাচার থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্রেতা চাই তিনি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হোক সরাসরি বা প্রতিনিধি হোক কিস্তি পরিশোধের দৃঢ় সংকল্প ও সামর্থ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যেন তার ধারণা মতে যথা সময়ে কিস্তি পরিশোধে সক্ষম হয়। তার আয় ও সম্পদের মাধ্যমে উক্ত কিস্তি পরিশোধ করা তার কর্তব্য। কেননা কিস্তি তার উপর ঋণ স্বরূপ। আর এক্ষেত্রে ঋণের বিধান কর্জের বিধানের মত। ফকীহগণ বলেন: রাষ্ট্র প্রধানও যদি কর্জ করে তবে তাকে ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতার বিষয়ে আশা থাকতে হব।[২৬]

নগদ মূল্যে ক্রয়ের সামর্থ্য থাকলে কিস্তিতে ক্রয়ের বিধান

কোন প্রয়োজন ছাড়া কর্জ গ্রহণ করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।[২৭] কেননা কর্জ গ্রহণ আকদ ইরফাক (عقد إرفاق) বা দাক্ষিণ্যের চুক্তি। যে ব্যক্তি এই দাক্ষিণ্যের হকদার তার জন্য ছাড়া ঋণ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা ঋণের মধ্যে ঋণগ্রহীতার উপর অনুগ্রহ করা হয়। কিন্তু নগদ মূল্যে ক্রয়ে সামর্থ থাকলেও কিস্তিতে পণ্য ক্রয় করা যেতে পারে। কেননা এ জাতীয় পরিস্থিতিতে ক্রেতা তার সম্পদ বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবহার করে। আর কিস্তিতে বেচাকেনার চুক্তি ও ঋণের চুক্তির মত নয় বরং এটি একটি বিনিময় চুক্তি। যাতে উভয় পক্ষ লাভবান হয়, আর এ কারণে এর মধ্যে সত্তাগতভাবে কোন দাক্ষিণ্যতা বা অনুগ্রহ নেই।[২৮]

* বিক্রেতার শিষ্টাচার

কিস্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতারও কিছু শিষ্টাচার রয়েছে। এর অন্যতম হল বিক্রেতা তার পণ্য শুধু বাকিতে অর্থাৎ কিস্তিতে বিক্রি করবে না। নগদ ও বাকি দুইভাবেই বিক্রি করবে।

ফকীহগণ বাঈ ইনার বিভিন্ন প্রকৃতি বর্ণনায় বলেন, এর এক আকৃতি এমনও আছে যে, কোন ব্যক্তির কাছে অনেক পণ্য রয়েছে কিন্তু সে বাকিতে ছাড়া তা নগদে বিক্রিয় করে না। ইমাম আহমদ এ জাতীয় ব্যবসাকে মাকরূহ হওয়া প্রমাণ করেছেন। ইব্‌ন আকীল বলেনঃ এ পদ্ধতি মাকরূহ হওয়ার কারণ সুদের সাথে এর সামঞ্জস্য, কেননা বাকিতে বিক্রিকারী সর্বদা চড়ামূল্য কামনা করে।[২৯] ইব্‌ন তাইমিয়া এ জাতীয় পদ্ধতিকে 'ক্রেতার উপর জবরদস্তিকারী বেচাকেনা' এর পর্যায়ভুক্ত করে বলেনঃ যারা বাকিতে পণ্য ক্রয় করে তাদের অধিকাংশ নগদ মূল্য পরিশোধে অক্ষমতার কারণে ক্রয় করে থাকে। যদি কেউ বাকিতে ছাড়া মালামাল বিক্রয় না করে তবে ঐ মালামাল থেকে অর্জিত মুনাফা রাষ্ট্র নিয়ে নিবে এবং তা নিঃস্ব, মুখাপেক্ষী মানুষের জন্য ব্যয় করবে। আর যদি সে নগদ ও বাকি উভয় পদ্ধতিতে মালামাল বিক্রয় করে তবে তাকে প্রকৃত ব্যবসায়ী হিসেবে গণ্য করা হবে।[৩০] অতএব বলা যায়, যদি ব্যবসায়ী বাঈ ইনার মত সুদকে বৈধ করার কৌশল হিসেবে বাকিতে ছাড়া মালামাল বিক্রি না করে তবে তা অবশ্যই মাকরূহ এমনকি হারাম হওয়ার সম্ভাব্যতা রাখে।

বিক্রেতার অন্যতম শিষ্টাচার কিস্তিতে মালামাল বিক্রির ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অক্ষম ক্রেতার উপর অনুগ্রহের উদ্দেশ্য করা।

ফকীহগণ বলেনঃ যদি বিক্রেতা কিস্তিতে মালামাল বিক্রি থেকে গরীব ক্রেতার উপর অনুগ্রহের নিয়ত করে এবং তার কিস্তির শর্তাবলি সহজ করে তবে এই চুক্তি তার জন্য মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে। এর প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসঃ "তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে, তার মধ্যে একটি বাকিতে বেচাকেনা.. ।"[৩১] আর যদি কেবলমাত্র ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের নিয়াত করে তবে শুধুমাত্র একটি বৈধ ব্যবসায়িক চুক্তিই বিবেচিত হবে।

*** বিক্রয়চুক্তি**

বিক্রয়মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের শর্তটি মূল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা বিক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উভয়পক্ষ দ্রব্যমূল্যে কোন প্রকার বৃদ্ধি ছাড়া এ বিষয়ে ঐকমত্য হতে পারে। কেননা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মূল্য পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করলে তা নিষিদ্ধ সুদের পর্যায়ে চলে যাবে। কিস্তিতে দ্রব্যমূল্য পরিশোধের বিষয়টি মূল চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হোক বা পরবর্তীতে এ বিষয়ে পক্ষদ্বয় একমত হোক এ উভয় অবস্থাতে অবশ্যই কিস্তি সমাপ্তির মেয়াদকাল, কিস্তির সংখ্যা ও পরিমাণ উভয় পক্ষের কাছে সুস্পষ্ট হতে হবে। কেননা এ সব বিষয়ে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকলে তা চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়কে ঝগড়া-বিবাদের দিকে ঠেলে দেবে এবং এ কারণে তাদের কৃত চুক্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

হাদীস থেকে উপরিউক্ত বক্তব্যের দলিল গ্রহণ করা যায়; ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন সেখানকার মানুষেরা খেজুর ক্রয়ের জন্য দুই-তিন বছরের অগ্রিম অর্থ প্রদান করে রাখে।

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "কোন ব্যক্তি খেজুরের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করলে সে যেন একটি নির্দিষ্ট ওজন পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রিম দেয়।[৩২]

অনির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা ঋণদাতা দ্রুত ঋণের অর্থ ফেরত পেতে চান অপরপক্ষে ঋণ গ্রহীতা এক্ষেত্রে বিলম্ব বা অবকাশ চান। এ জন্য ইসলাম ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক চুক্তি সম্পাদনের তাগিদ প্রদান করে।

*** পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণ করার আবশ্যকতা**

কিস্তিতে বেচাকেনা বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত কিস্তির মেয়াদ নির্ধারণ ও উভয়পক্ষ তা জ্ঞাত থাকা। কেননা এক্ষেত্রে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ঝগড়া-বিবাদের দিকে ধাবিত করে। যার কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যেতে পারে। আল্লামা কাসানী র. বলেন: বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ শর্ত করা হয়েছে যে, বাকি পরিশোধের মেয়াদকাল স্পষ্ট হতে হবে। কেননা এটির অস্পষ্টতা বেচাকেনাকে নষ্ট করে দেয়। অস্পষ্টতা দমকা বাতাস, আকাশের বৃষ্টি ইত্যাদির মতো কোন অস্বাভাবিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হোক, অথবা তাকে ফসল কর্তন, হাজীদের আগমন ইত্যাদির মতো কোন ভাল কাজের সাথে সম্পর্কিত করা হোক। তিনি আরও উল্লেখ করেন, যদি বাকি পরিশোধের এই অস্পষ্ট সময় কোন ভাল কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় অত:পর সে কাংখিত সময় আসার আগেই বা বিভ্রান্তিমূলক মেয়াদের কারণে বিক্রয় চুক্তি রহিত হওয়ার আগেই ক্রেতা বাকিতে পরিশোধের চুক্তি বাতিল করে দেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ এর মতে তা বৈধ হবে। ইমাম যুফারের মতে বৈধ হবে না। আর যদি চুক্তি কার্যকর হয় এবং ক্রেতা চুক্তি বাতিল না করে ইতিমধ্যে মানুষ ফসল কাটা শুরু করে তখন যদি ক্রেতা চুক্তি বাতিল করে তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্য অনুযায়ী তা বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি অজ্ঞতার বিষয়টি কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং পক্ষদ্বয় বেচাকেনার আসর থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই বাকি চুক্তি বাতিল করে নগদ মূল্য প্রদান করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবানের মতে বেচাকেনা বৈধ হবে। ইমাম যুফারের মতে বৈধ হবে না। আর যদি চুক্তি বাতিলের আগে পক্ষদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তাদের ঐক্যমত অনুযায়ী বৈধ হবে না।[৩৩] বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ অজ্ঞাত থাকলে বেচাকেনা নষ্ট হওয়ার পক্ষে মতামত মালিকী[৩৪] শাফিয়ী[৩৫] ও হাম্বালী[৩৬] মাযহাবেও স্বীকৃত।

'রওদাতুন নাদীর' গ্রন্থকার যায়দিয়্যাদের অনুরূপ মতামত উল্লেখ করেছেন। তিনি যায়দ ইব্‌ন আলী থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে তিনি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف "অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বাকিতে বেচাকেনা বৈধ নয়।"[৩৭] ইমামিয়্যাহ, ইবাদিয়্যাহ ও জাহিরিয়্যাহ সম্প্রদায়ও একই মত পোষণ করেন।[৩৮]

ইব্‌ন আবিদীন বলেন: যদি কেউ অনির্ধারিত সময়ের জন্য বাকিতে মাল বিক্রয় করে এভাবে যে আমি এটি এক দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে তোমার কাছে বিক্রয় করলাম তবে এর মেয়াদ হবে একমাস। কেননা এ সময়কাল সালাম ও ইয়ামিনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৩৯]

*** কিস্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি**

কিস্তিতে বিক্রয়ের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে মূল্যটি ক্রেতার উপর অর্পিত ঋণ হয়ে যায়। তাই বিক্রেতা এ ক্ষেত্রে ঋণের গ্যারান্টি দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। এ গ্যারান্টি কয়েকভাবে হতে পারে।

ক) বন্ধক

ঋণের গ্যারান্টি হিসেবে বিক্রেতা ক্রেতার মালিকানাধীন কোন বস্তু নিজের কাছে রেখে দিবেন। তবে উক্ত বস্তু থেকে কোন প্রকার উপকার হাসিল করতে পারবেন না। কেননা বন্ধকী বস্তু থেকে কোন প্রকার উপকার হাসিল করা সুদেরই একটি প্রকার বিধায় তা বৈধ নয়। বস্তুটি বিক্রেতার কাছে শুধুমাত্র এ কারণে রাখা হয় যে, ক্রেতা যেন এ বন্ধকী বস্তু হারানোর ভয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ আদায় করে। যদি নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয় তবে বিক্রেতা বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করে তার ঋণ উসূল করে নিতে পারবেন। তবে তার নির্ধারিত পাওনা অর্থাৎ চুক্তির সময় যে মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করা বৈধ হবে না। অতএব বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে তার পাওনা নেয়ার পর যদি অতিরিক্ত কোন অর্থ বিক্রেতার হাতে থাকে তা ক্রেতাকে (ঋণী ব্যক্তি অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর মূল মালিক) ফেরত দেয়া আবশ্যক।[৪০]

ভাসমান বন্ধক : Floating Mortgage

বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন এক বন্ধক প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়। যে পদ্ধতিতে বন্ধকগ্রহীতা (Mortgagee) বন্ধকী বস্তু করায়ত্ত করে না বরং তা বন্ধকদাতার (Mortgagor) কাছেই থাকে। তবে বন্ধকদাতা যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তখন বন্ধকগ্রহীতা তাকে বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার দাবি করতে পারে। এ ধরনের বন্ধককে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- الرهن السائل (Floating Mortgage) ভাসমান বন্ধক,

الرهن السادج، (Simple Mortgage) সাধারণ বন্ধক, الذمة السائلة (Floating Charge) ভাসমান কর্তব্য ইত্যাদি। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ জাতীয় বন্ধকের বিধান নির্ণয়ে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু করায়ত্ত করা শর্ত। আল্লাহ বলেন: "... তবে বন্ধকী

বস্তু হস্তগত রাখা উচিৎ...।"[৪১] কিন্তু বন্ধকের উপর্যুক্ত পন্থায় বন্ধকী বস্তু করায়ত্ত হয় না। যদি করায়ত্ত হয় তবে পুনরায় বন্ধকদাতা উক্ত বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতা থেকে কর্জ হিসেবে ফেরত নিয়ে ব্যবহার করতে পারতেন। ফকীহগণ এ জাতীয় খিয়ারের পুনর্বিবেচনার বৈধতা বর্ণনা করেছেন।[৪২] কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু কোনক্রমেই বন্ধকগ্রহীতা করায়ত্ত করেনি। সুতরাং এ জাতীয় বন্ধকের বৈধতার কোন উপায় পূর্ববর্তী ফিক্‌হের কিতাবে পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিচারপতি তাকী উসমানী এ ধরণের বন্ধক পদ্ধতির বৈধতার জন্য গবেষণাধর্মী এক প্রস্তাব পেশ করেছেন। যা সার্বিক অবস্থা বিচারে যুক্তিগ্রাহ্য।[৪৩]

খ) বিক্রিত পণ্য আটক রাখা

ঋণের গ্যারান্টি হিসেবে বর্তমান সময়ে এক বিশেষ পদ্ধতি চালু আছে তা হল, বিক্রেতা ততদিন পর্যন্ত তার বিক্রিত পণ্য নিজের কাছে আটক রাখে যতদিন পর্যন্ত ক্রেতা নির্ধারিত কয়েক কিস্তি বা সম্পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ না করে। বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য আটক দুইভাবে হতে পারে।[৪৪]

১. মূল্য পরিশোধের জন্য পণ্য আটক করা।

২. বন্ধকস্বরূপ আটক করা।

উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথম পদ্ধতিতে মূল্য আদায়ের জন্য পণ্য আটক করা হয়। আর এক্ষেত্রে পণ্যটি অর্থনীতির ভাষায় 'মূল্য' হয় না বরং 'মূল্যমান' হয়। অতএব আটক অবস্থায় পণ্যটি ধ্বংস হলে বেচাকেনা রহিত হয়ে যাবে ফলে বিক্রেতার উপর বাজারদর অনুযায়ী জামানত আরোপিত হবে না।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে উক্ত পণ্যটি বন্ধকী বস্তু হিসেবে গণ্য হয়। অতএব আটক অবস্থায় বিক্রেতার সাবধানতা সত্ত্বেও পণ্যটি ধ্বংস হলে বেচাকেনা রহিত হবে না; বরং এটি ক্রেতার সম্পদ বিবেচ্য হবে এবং তিনি এর মূল্য পরিশোধে বাধ্য হবেন। আর বিক্রেতার অসাবধানতায় পণ্যটি ধ্বংস হলে তিনি পণ্যটির বাজারদরের জামিন হবেন। নির্ধারিত মূল্যের জামিন হবেন না।

কিস্তিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি তথা মূল্য আদায়ের জন্য পণ্য আটকে রাখা জায়েয নেই। কেননা এ পদ্ধতি মূলত: বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের নামান্তর। মূল্য উসুলের জন্য পণ্য আটকে রাখা শুধুমাত্র নগদ বিক্রিতে বৈধ। এ সম্পর্কে ফাতওয়ায়ে হিন্দীয়াতে উল্লেখ করা হয়েছ: "হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, নগদ বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য উসুলের জন্য বিক্রেতার পণ্য আটকের অধিকার আছে। এটি আল-মুহীত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি বাকিতে বিক্রি হয় তবে সেক্ষেত্রে পণ্য আটকের কোন অধিকার বিক্রেতার নেই। না পরিশোধের মেয়াদের আগে না পরে। এটি আল-মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৪৫]

দ্বিতীয় অবস্থা তথা বন্ধক হিসেবে পণ্য আটক রাখার দুটি পদ্ধতি হতে পারে:

এক. ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করার পূর্বে বিক্রেতার কাছে বন্ধক হিসেবে ছেড়ে দিতে পারে। এ পদ্ধতিটি বৈধ নয়। কেননা এটি প্রথম অবস্থা তথা 'বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য উসুলের জন্য পণ্য আটককরণ' এর অনুরূপ।

দুই. ক্রেতা প্রথমে পণ্যটি করায়ত্ত করবে। অতঃপর তা বিক্রেতার কাছে বন্ধক হিসেবে হস্তান্তর করবে। এটি অধিকাংশ আলিমের মতে জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ র. 'জামিউস্‌সগীর' গ্রন্থে বলেন: "যদি কেউ কয়েক দিরহামের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় করে, অত:পর ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে এই কাপড়টুকু তোমার কাছে ততক্ষণ রাখ যতক্ষণ না আমি এর মূল্য প্রদান করি; তবে ঐ কাপড় বন্ধক গণ্য হবে।"[৪৬] অতএব এ ধরনের বন্ধক বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, মূল চুক্তিতে বন্ধকের শর্ত থাকবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে বন্ধকের শর্ত থাকলে তার বৈধতার ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।[৪৭]

গ) জামানাত

ঋণের গ্যারান্টির অন্য একটি পন্থা তৃতীয় ব্যক্তির (Third Party) জামানাত। অর্থাৎ তৃতীয় কোন ব্যক্তির জামিন হওয়া। ক্রেতা কোন কারণে কিস্তির অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তখন ঐ জামিন তার অর্থ পরিশোধে বাধ্য হন। এ ধরণের জামানতকে ইসলামী পরিভাষায় 'কাফালাহ' বলা হয়। ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হল, জামানতের বৈধতা প্রমাণিত। কিন্তু জামানতের বিপরীতে বিনিময় বা পারিশ্রমিক বৈধ নয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুটি জিনিস দাবি করা বৈধ হতে পারে:

১. জামানত প্রমাণের জন্য সার্টিফিকেট বিশেষত: ক্রেডিট লেটার (Letter of Credit) ইত্যাদি ইস্যু করতে যে খরচ হবে তা গ্রাহক থেকে নেয়া যাবে।

২. আমদানিকারক ও রপ্তানিকারদের মধ্যে কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পারিশ্রমিক দাবি করা বৈধ।[৪৮]

* ক্রেতা নিঃস্ব হলে

ক্রেতা যথাসময়ে তার কিস্তি প্রদান করবেন। কেননা এ ব্যাপারে তিনি চুক্তিবদ্ধ। যদি তিনি সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও কিস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন তবে বিচারক বা তার প্রতিনিধি কিস্তির অর্থ আদায় করতে বাধ্য করতে পারবেন। একইভাবে ফকীহদের অভিমত যদি ক্রেতা দেউলিয়া / নিঃস্ব বা অক্ষম হয়ে যান অথবা ক্রেতা বিক্রয় স্থান থেকে কসর নামাযের হুকুম প্রযোজ্য হয় এমন দূরত্বের স্থানে চলে যান তবে বিক্রেতা উক্ত বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।[৪৯] এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন:

أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل ، وقد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء

"যদি কেউ কোন পণ্য বিক্রি করে, অত:পর তা কারো কাছে উক্ত পণ্য হুবহু পায় অথচ ঐ ব্যক্তি অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে যায় এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা মূল্যের কিছুই গ্রহণ না করে থাকে তবে ঐ পণ্য তার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি মূল্যের কিছু অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে তা ঋণের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৫০]

* ক্রেতা-বিক্রেতার মৃত্যুজনিত অবস্থা

যদি চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষ চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে মারা যান তবে এক্ষেত্রে বেশকিছু শরয়ী বিধান অর্পিত হবে। যেমন- যদি বিক্রেতার মৃত্যু হয় তবে ঋণ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিবেচিত হবে এবং ক্রেতাকে তাৎক্ষণিক সমুদয় অর্থ পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না। তবে ঋণের মালিকানা চলে যাবে মৃতের ওয়ারিশদের উপর। ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করলে কিস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তা পরিশোধ করার জন্য ক্রেতার কাছে আবেদন করতে পারবেন।[৫১] আর যদি ক্রেতা মৃত্যুবরণ করেন তবে তার বিধান নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের আলিমদের মতে সমুদয় অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দিতে হবে। কেননা ক্রেতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অচিরেই তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, সুতরাং এ মুহূর্তে তার ঋণ পরিশোধ করা না হলে ঋণ অপরিশোধিত থেকে যাবে। ইমাম আহমদ র. থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তবে হাম্বলী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মত হল, যদি ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীরা ঋণের সত্যায়ন করে, তা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং এর বিপরীতে কোন জামিন বা বন্ধক রাখে তবে ঋণ নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করতে হবে। বর্তমান সময়ের আলেমগণ শেষোক্ত মতটিই গ্রহণ করেছেন।

* পণ্যের মালিকানা

কিস্তিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার এবং পণ্যের মূল্যের মালিকানা বিক্রেতার। তবে ক্রেতার মালিকানা থাকলেও শর্তসাপেক্ষ। কিস্তিতে বিক্রয়ের ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা নগদ মূল্যে উক্ত পণ্য অন্যত্র বিক্রয় করতে পারবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তা বাঈ ইনার পর্যায়ে চলে যাবে। একইভাবে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে আলাদা কোন সুবিধা দিতে পারবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে এটি লাভের বিনিময়ে ঋণ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত হবে যা সুদের পর্যায়ভুক্ত।[৫২]

মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে অগ্রিম পরিশোধের কারণে ঋণ হ্রাস করা

মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার বিপরীতে ঋণের কিছু হ্রাস করা ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থসমূহে ضع و تعجل 'তড়িৎ পরিশোধ ও ছাড়' শিরোনামে পরিচিত। এর বিধান বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে অদ্যবধি আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাদের মতামতকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম মত: এ পদ্ধতি অবৈধ। এ মতের পক্ষে রয়েছেন উমর বিন খাত্তাব ও তৎপুত্র আব্দুল্লাহ, যায়িদ ইব্ন সাবিত, মিকদাদ রা., হাসান বসরী, সালেম, হাকাম, শা'বী, হিশাম ইব্ন আরওয়া, সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন উয়াইনা, ইব্ন আলীয়াহ, ইসহাক, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব ও প্রখ্যাত চার ইমামের।[৫৩]

তাদের দলিল:

১. মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একশত দিনার ঋণ দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে রসূলুল্লাহ স. এক প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছিলেন যার মধ্যে আমার নামও ছিল। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, তুমি যদি এখনই আমাকে নব্বই দিনার পরিশোধ কর তবে আমি তোমাকে দশ দিনার ছাড় দিব। অতঃপর বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে আলোচিত হলে তিনি বললেন: হে মিকদাদ! তুমি নিজে সুদ খেলে এবং তাকেও খাওয়ালে।[৫৪]

২. ইব্ন উমরকে রা. এ লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা নিষেধ করেন। অনুরূপভাবে তাঁর পিতা উমর রা. থেকেও একই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।[৫৫]

৩. ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায় যায়িদ ইব্ন সাবিত থেকে এ নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

দ্বিতীয় মত: যেহেতু এ পদ্ধতিতে ঋণদাতা তথা বিক্রেতা তার প্রাপ্য কিছুটা গ্রহণ করে আর কিছুটা ছাড় দেয় সুতরাং এ পদ্ধতি বৈধ। এ মতের পক্ষে রয়েছেন- আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রা., ইব্রাহীম নাখয়ী, হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার, শাফিয়ী মাযহাবের আবু ছাওর প্রমুখ।[৫৭]

তাদের দলিল: আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রা থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ স. বনী নজীর গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তাদের কিছু লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাদেরকে মদীনা থেকে বের হয়ে যেতে বলেছেন, অথচ তাদের কাছে বিভিন্ন লোকের ঋণ রয়েছে যা পরিশোধের সময় এখনো হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন: কিছু ছাড় দাও এবং (বাকিটা) দ্রুত উসুল করে নাও।[৫৮]

তৃতীয় মত: ব্যবহার ভেদে এ পদ্ধতি বৈধ ও অবৈধ উভয় হতে পারে। ইমাম শাফিয়ী, মালিক, মুহাম্মদ, আবু বকর আল-জাস্সাস, ইব্ন জওযী, সাবকী, ইব্ন কুদামা, আইনী, হাসকাফী, ইব্ন আবিদীন প্রমুখ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন।[৫৯] যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. 'তড়িৎ উসুল ও ছাড়' নীতি কর্জের ক্ষেত্রে বৈধ। কেননা কর্জ ديون حالة বা উপস্থিত ঋণ যা পরিশোধের কোন সময় নির্ধারণ করা হয় না। এর দলিল ইমাম বুখারী র. বর্ণিত কা'ব ইব্ন মালিকের রা. হাদীস। কা'ব রা. আব্দুলাহ ইব্ন আবি হাদ্দাদ আসলামীকে

রা. ঋণ প্রদান করেন। একদিন উভয়ে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে মসজিদের মধ্যে বাক-বিত ায় লিপ্ত হন। তাদের উচ্চ আওয়াজ শুনে রসূলুল্লাহ স. হুজরা থেকে বের হয়ে তাদের কাছে আসেন এবং কা'বকে রা. ডেকে বলেন: হে কা'ব! অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় বুঝালেন, অর্ধেক ঋণ নাও এবং বাকি অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব রা. তাই করলেন।[৬০]

২. ديون مؤجلة বা বাকি ঋণ যা পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত তার ক্ষেত্রে 'তড়িৎ উসুল ও ছাড়' নীতি তখনই বৈধ হবে যখন চুক্তিতে এ সম্পর্কিত কোন শর্ত থাকবে না। বরং ঋণগ্রহীতা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়ায় ঋণদাতা খুশী হয়ে অনির্ধারিত কিছু ছাড় প্রদান করে।

৩. মুসাওয়ামা (যে বেচাকেনায় বিক্রেতা তার লভ্যাংশ গোপন রাখে) পদ্ধতিতে বেচাকেনায় 'তড়িৎ উসুল ও ছাড়' নীতি নাজায়েয। তবে মুরাবাহা (যে পদ্ধতিতে বিক্রেতা তার লভ্যাংশ ক্রেতার কাছে স্পষ্ট করে) পদ্ধতিতে বেচাকেনায় যদি ক্রেতা মেয়াদোত্তীর্ণের আগে ঋণ পরিশোধ করে বা মারা যায় তবে বিক্রেতা বাকি দিনগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থের অংশ ছেড়ে দেবেন।

৪. মেয়াদোত্তীর্ণের পর যদি ক্রেতা কিস্তি দিতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য বিভিন্ন ধরণের সহজ শর্ত প্রয়োগ বৈধ। যার মধ্যে 'তড়িৎ উসুল ও ছাড়' নীতিও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কিস্তিতে বেচাকেনার বহুল প্রচলিত কয়েকটি পদ্ধতি

কিস্তিতে বেচাকেনা শরয়ীভাবে বৈধ হলেও পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে তা অবৈধতায় রূপ নিতে পারে। এসংক্রান্ত দুটি বহুল প্রচলিত ভুল পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. বিক্রেতা বলল, এই পণ্যটির নগদমূল্য ১০০০ টাকা, এক মাসের জন্য বাকিতে নিলে ১০১০ টাকা, দুই মাসের জন্য নিলে ১০২০ টাকা...... এধরনের প্রস্তাব থেকে যদি ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে বিক্রেতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে তা বৈধ। যেমন- যদি সে বলে আমি দুই মাসের জন্য বাকিতে ১০২০ টাকা দিয়ে ক্রয় করলাম।

কিন্তু বিক্রেতা যদি বলে, এই পণ্যটির নগদমূল্য ১০০০ টাকা, এক মাসের জন্য বাকিতে নিলে ১০১০ টাকা, দুই মাসের জন্য নিলে ১০২০ টাকা...... অতএব তুমি যদি এখন মূল্য পরিশোধ কর তবে দিতে হবে ১০০০, যদি এক মাস পরে পরিশাধ কর তবে দিতে হবে ১০১০ টাকা আর যদি দুই মাস পরে পরিশোধ কর তবে দিতে হবে ২০২০ টাকা। অত:পর ক্রেতা কোনটি নির্দিষ্ট না করে তবে তা বৈধ হবে না।

২. যদি পণ্য একমাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ১০১০ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে দুই মাসের জন্য ১০২০ টাকার বিনিময়ে পুন:চুক্তি করা যাবে না।

কিস্তি পরিশোধে উৎসাহ ও বাধ্যবাধকতা

কিস্তির অর্থ সময় মত পরিশোধ করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোরতা প্রদান করে। যেহেতু কিস্তির অর্থ ক্রেতার ঘাড়ে ঋণস্বরূপ তাই ইসলাম বিভিন্নভাবে এ ঋণ পরিশোধের তাগিদ দেয় এবং অনাদায়ের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার বৈধতা প্রদান করে। এ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

ঋণ পরিশোধের নির্দেশ

ইসলাম ঋণকে ঋণগ্রহীতার ঘাড়ে এক বড় আমানত হিসেবে গণ্য করে এবং তা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা আমানত তার প্রাপকের হাতে পৌঁছে দাও।"[৬১] ইমাম সুয়ূতী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আয়াতে অন্যের সঞ্চিত ধন, কর্জ, আমানত ফিরিয়ে দেয়ার আবশ্যকতা বর্ণনা করা হয়েছে।[৬২] আর এ কারণেই ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীর "বাবু আদাইদ দুয়ূন" (ঋণ আদায় বিষয়ক পরিচ্ছেদ) এই আয়াতে কারীমা দিয়ে শুরু করেছেন।

ঋণ আদায়ের আবশ্যকতা ও বাধ্যবাধকতা বর্ণনার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপযুক্ত ও সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। আবু যর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম তিনি ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পছন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনা হয়ে যাক এবং একটি দিনারও আমার নিকট তিন দিনের বেশি থাকুক। তবে সেই দিনার ব্যতীত যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই।"[৬৩]

আল্লামা আইনী বলেন: এ হাদীসে ঋণ আদায়ের গুরুত্ব ও তা পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[৬৪]

উত্তমভাবে পরিশোধ করার প্রতি উৎসাহ

ইসলাম শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং ঋণ পরিশোধের সময় উত্তমভাবে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎভাবে ঋণ আদায়কে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء سمح القضاء

"মহান আল্লাহ উদারতাপূর্ণ বিক্রয়, উদারতাপূর্ণ ক্রয় ও উদারতাপূর্ণ পরিশোধকে ভালবাসেন।"[৬৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তমভাবে পরিশোধকারীকে উত্তম মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম মুসলিম আবু রাফে' থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে পাওনাদারের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম।"[৬৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে উত্তমভাবে পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করেছেন। বুখারী শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম তিনি মসজিদে ছিলেন; তিনি আমাকে বললেন: দুই রাকাআত নামায আদায় কর, তাঁর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল, তিনি তা পরিশোধ করলেন এবং পরিশোধের সময় প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দিলেন।"[৬৭]

টালবাহানার নিষিদ্ধতা

কোন প্রকার ওজর আপত্তি ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। মহান আল্লাহর বাণী: "যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদের থেকে যাবে এক্ষেত্রে তোমরা জুলুম করবে না বা জুলুমের শিকার হবে না।"[৬৮] ইমাম ইলকিয়া আল-হারাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যদি ঋণগ্রহীতা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে তবে সে জালিম হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মূলধন তোমাদের থেকে যাবে।" আর ঋণদাতা তার মূলধন তলব করে, সুতরাং ঋণদাতার তার মূলধন তলব করার অধিকার রয়েছে একইভাবে ঋণগ্রহীতার উপর ঋণ পরিশোধ ওয়াজিব। আর আল্লাহর বাণী: "তোমরা জুলুম করবে না বা জুলুমের শিকার হবে না।" এ প্রমাণ বহন করে যে, কারো মূলধন ফিরিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকাও জুলুম, একইভাবে বাড়তি অর্থ চাওয়াও জুলুম।[৬৯]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদানে বিলম্ব করাকে জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ধনী টালবাহানাকারী জালিম।"[৭০] আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: ধনী ও সক্ষম ব্যক্তির জন্য ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বিলম্ব করা হারাম, অক্ষম হলে ভিন্ন কথা।[৭১]

ঋণ পরিশোধে টালবাহানাকারী ফাসেক, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

উপরিউক্ত হাদীসকে দলিল সাব্যস্ত করে জমহুর আলিমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঋণ পরিশোধে টালবাহানাকারী ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায় এবং তার সাক্ষ্য ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একবার টালবাহানা করলেই কি সে ফাসেক হয়ে যায় না কি একাধিকবার করলে এ বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন। আল্লামা আইনী বলেন: অত্র হাদীসে ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদের এ জাতীয় কাজ কবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুর আলিমগণ

একমত যে, ঋণ পরিশোধে সক্ষম অথচ টালবাহানা করে এমন ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়; কিন্তু একবার টালবাহানা করলে তার ফাসেক হওয়া সাব্যস্ত হয় কিনা? এ সম্পর্কে আল্লামা নবভী বলেন: আমাদের মাজহাব অনুযায়ী একবারেই নয় বরং বারংবার এমনটি করলে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আল্লামা শাবকী বলেন, আমাদের মাজহাবের নিয়ম এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ- একবার করলেই সে ফাসেক বলে গণ্য হবে)। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন- কোন প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়া ঋণদাতার ঋণ প্রদান না করা তার অধিকার বঞ্চিত করার মত যাকে ছিনতাই বলা যায়, ছিনতাই বা অপহরণ কবীরা গুনাহ যা মানুষকে জালেম বানায়; আর কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ একবার করলেই সেটা কবীরা হিসেবে গণ্য হয়।[৭২]

কিস্তির অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা ও ঋণ একই অর্থ বিধায় কিস্তি প্রদানে টালবাহানাকারীর বিধানও একই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা থেকে বিরত থাকতেন

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেউ ঋণ পরিশোধ না করে ইন্তেকাল করলে তার জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির লাশ আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তিনি ঋণ পরিশোধের মত কোন অবলম্বন রেখে গেছে কি? যদি বলা হত তিনি ঋণ পরিশোধের অবলম্বন রেখে গেছেন তবে তিনি জানাযা পড়াতেন, আর না থাকলে সাহাবীদের বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় কর। অত:পর যখন আল্লাহ মহাবিজয় (মক্কা বিজয়) দান করলেন তখন তিনি বললেন: "আমি মুমিনদের জীবনের চেয়ে অধিকতর হকদার, যদি কেউ ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর যে কোন সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদের জন্য।"[৭৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কর্মকাণ্ডটি ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপস্বরূপ, যাতে এর গুরুত্ব অনুভব করে সাহাবীগণ আল্লাহর রসূলুল্লাহ কর্তৃক জানাযা পড়ার মহান বরকত থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে ইমাম নবভী বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জানাযা পরিত্যাগ করার কারণ তাদের জীবদ্দশায় ঋণ পরিশোধে উৎসাহ প্রদান এবং ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার গুরুত্ব বুঝানো যাতে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ (জানাযা) থেকে বঞ্চিত না হয়।[৭৪]

দায়গ্রস্ততার পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুমিনের নফস তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ না তা পরিশোধ

করা হয়।"[৭৫] আত্মা ঝুলন্ত থাকার অর্থ আত্মার অধিকারী মানুষটির বেহেশতে প্রবেশের বিষয়টি ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদীসে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যদি কোন শহীদ ঋণগ্রস্ত থাকে তবে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এমন কি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসংখ্যবার আল্লাহর পথে নিহত হয় তবুও তার ঋণ তার ও জান্নাতের মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মদ বিন জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠালেন, তাঁর কপালে প্রশান্তির চিহ্ন দেখা গেল এবং তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহ! এক কঠোর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।" এরপর আমরা চুপ করে থাকলাম এমনকি স্থান ত্যাগ করলাম এবং পরের দিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এমন কি কঠিন বিধান নাযিল হয়েছে? তখন তিনি বললেন: "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, অত:পর আবার জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয়, আবার জীবন লাভ করে আবার শহীদ হয় আর তার উপর ঋণের দায়বদ্ধতা থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ আদায় করা হয়।"[৭৬]

ইসলামী নীতিমালায় অনাদায়ী

ইসলাম অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে। নিম্নোক্তভাবে এ সংক্রান্ত নীতিমালা বিশ্লেষণ করা যায়:

১. ক্রেতার উপর পরোয়ানা

যে সব ব্যক্তি তার সম্পদের তুলনায় বেশি ঋণ গ্রহণ করে বা ঋণ করে পরিশোধ করতে চায় না অথবা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করতে টালবাহানা করে ইসলাম এ জাতীয় মানুষের কবল থেকে ঋণদাতা বা ব্যাবসায়ীদের পাওনা অর্থ উদ্ধারের নিমিত্তে তাদের সাধারণ স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতা জুড়ে দেয় এবং তাদের উপর পরোয়ানা জারি করে। এক্ষেত্রে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে :

প্রথমত: সম্পদ জব্দকরণ

কোন ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ তার সম্পদের চেয়ে বেশি হলে প্রশাসক কর্তৃক তার সম্পদে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করাকে ইসলামী ফিকহর পরিভাষায় 'হাজর' বা জব্দকরণ বলা হয়। ইমাম উবনু কুদামা বলেন: "শরীয়তের পরিভাষায় কোন মানুষের নিজস্ব সম্পদে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করাকে হাজর বলা হয়।"[৭৭]

সম্পদ জব্দকরণের শরয়ী দলিল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়াজ বিন জাবাল রা. এর সম্পদ জব্দ করেন। কা'ব বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম মায়াজ বিন জাবালের সম্পদ জব্দ করেন এবং তা বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ করেন।[৭৮]
আমীর মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-সেনআনী বলেন: হাদীসটি প্রশাসক কর্তৃক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদে হস্তক্ষেপ এবং তার ঋণ পরিশোধের জন্য বিক্রয়ের বৈধতার দলিল।[৭৯]
সরকার কর্তৃক কোন সম্পদ জব্দ করার পর সম্পদের মালিক কর্তৃক উক্ত সম্পদে হস্তক্ষেপ করলে তা আদালতে অগ্রাহ্য হবে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, এক ব্যক্তি একটি মুদাব্বার[৮০] ও কিছু ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত দাস বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন, অত:পর তারা তাকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়।[৮১] যদি উক্ত ব্যক্তি কোন দান-সাদকাহ করে তবে তা পরিত্যাক্ত হবে। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ফরজ আর সাদকাহ করা নফল।

দ্বিতীয়ত : গ্রেফতার

যদি কিস্তি পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি কিস্তি পরিশোধ না করে বা টালবাহানা করে তবে ইসলাম তাকে গ্রেফতার করার বৈধতা দেয়। শারীদ বিন আউস আল-ছাকাফী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ধনী ব্যক্তি যদি (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করে তবে তাকে লজ্জিত করা ও শাস্তি প্রদান বৈধ হয়ে যায়।"[৮২]
ইমাম বুখারী সুফিয়ান থেকে এবং ইবনু আবি শায়বা ওয়াকী থেকে বর্ণনা করেন: হাদীসে বর্ণিত শাস্তি প্রদান অর্থ আটক করা।[৮৩]
হাদীসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী বলেন: "হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় সক্ষম ঋণগ্রস্তকে আটক করা বৈধ। কেননা সে মুহূর্তে উক্ত ব্যক্তি জালিম থাকে তাই তাকে আটক করে শিক্ষা দেয়া হয়, আর জুলুম সব সময় হারাম তা যৎকিঞ্চিৎ হোক।"[৮৪]
এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন আলেম অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকেও আটক করার বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। আল্লামা খাত্তাবী দেখিয়েছেন, শরীয়তে মতে অক্ষম ও সক্ষম উভয় ধরণের ঋণগ্রস্তকে আটক বৈধ, মালেকী মাজহাব অনুযায়ী অক্ষম খাতককে আটক করা যাবে না, শাফেয়ী মাজহাব অনুযায়ী ঋণগ্রস্তের বাহ্যিক অবস্থা দেখে যদি মনে হয় সে অক্ষম তবে তাকে আটকানো যাবে না আর যদি মনে হয় সে সক্ষম তবে আটকানো হবে।[৮৫]

তৃতীয়ত: বর্হিগমণ নিষিদ্ধকরণ

কিস্তি বা ঋণের অর্থ বাকি থাকা অবস্থায় ঋণদাতা বা কোম্পানি যদি আশঙ্কা করে যে ঋণগ্রহীতা দেশের বাইরে গেলে তার পাওনা পরিশোধ হবে না তবে ঋণদাতা প্রশাসক বরাবর বর্হিগমণ নিষিদ্ধ করার আবেদন করতে পারেন। এ সম্পর্কে ইমাম আল-খারকী বলেন: যদি কেউ ভ্রমণে যাওয়ার নিয়াত করে এবং সে কারো কাছে ঋণী থাকে আর ভ্রমণ

থেকে ফিরে আসার আগে তার ঋণের মেয়াদপূর্ণ হয় তবে ঋণদাতা ইচ্ছা করলে তার বর্হিগমণ নিষিদ্ধ করতে পারেন। ইমাম খারকীর এ অংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কুদামাহ বলেন: "কোন ঋণী ব্যক্তি বহির্গমণের ইচ্ছা করলে আর ঋণদাতা তার সফর নিষিদ্ধ করতে চাইলে সেক্ষেত্রে বিধান হলো- যদি ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দায়গ্রস্তের ফেরার তারিখের আগে হয়, যেমন- ঋণগ্রহীতা যদি হজ্জে যান এবং তার ফেরার সম্ভাব্য তারিখ থাকে সফর মাসে কিন্তু ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকে মুহররম বা জিলহজ্জ মাসে তবে ঋণদাতা তার বর্হিগমণ নিষিদ্ধ করার আবেদন করতে পারবেন। কেননা এক্ষেত্রে তার ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি ঐ ব্যক্তি কোন জামিন বা বন্ধক রেখে যায় তবে তার সফরে যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না, কেননা সেক্ষেত্রে জামিন বা বন্ধকের বিনিময়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি তার ফেরার তারিখ ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের আগে হয়, যেমন- ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে রবিউল আওয়াল মাসে আর তিনি ফিরে আসবেন সফর মাসে তবে সে ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন- যদি তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর করেন তবে ঋণদাতা তার সফর নিষিদ্ধ করার আবেদন করতে পারেন, যদি ঋণগ্রহীতা কোন জামিন বা বন্ধক না রাখেন। কেননা এ জাতীয় সফর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ, এক্ষেত্রে তার শহীদ হওয়া বা প্রাণ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা বিরাজ করে। আর যদি তার ভ্রমণ জিহাদ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় যেমন- সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ (Short Leave) বা জুময়ার নামাজ আদায় করার জন্য যাওয়া ইত্যাদি তবে ইমাম খারকীর মতানুযায়ী তার সফর নিষিদ্ধ করার আবেদন করার কোন অধিকার ঋণদাতার নেই। কেননা এ জাতীয় সফরের কারণে ঋণদাতার অধিকার খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইমাম আহমদ থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতামতের এটি একটি।[৮৬]

২. ঋণগ্রস্তকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারে কিন্তু পরিশোধ করতে চায় এসব মানুষের এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাতককে অবকাশ প্রদানের নির্দেশ ও তার সাথে আচরণের বিশেষ বিধি নির্ধারণ করেছে। তাকে ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার জন্য অন্যের থেকে সাহায্য গ্রহণের অধিকারও দিয়েছে। এ সাহায্য দুটি উৎস থেকে অর্জিত হতে পারে।

প্রথমত: ইসলামী সমাজের করণীয়

যাদের কাঁধে ঋণের বোঝা রয়েছে মহান আল্লাহ তাদেরকে যাকাত ও সাধারণ দানের হকদার ঘোষণা করেছেন: "নিশ্চয় সদকাহ তাদের জন্য যারা ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়ে কর্মচারী, যাদের মন জয় করা আবশ্যক, *ঋণগ্রস্ত*, আল্লাহর পথে সংগ্রামরত, পথিক...।"[৮৭]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয় দিতে যেয়ে ইমাম কুরতুবী বলেন: যাদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা রয়েছে কিন্তু তা পরিশোধ করার মত কোন অবলম্বন তার নেই।[৮৮]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণের দায়গ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি (ব্যাবসায়ের জন্য বিভিন্ন লোকের বাগানের) ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বললেন: তাকে দান-খয়রাত করে সাহায্য কর। তখন লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল, কিন্তু তাও তার ঋণের সমপরিমাণ হল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির পাওনাদারকে বললেন, যা সংগ্রহ হয়েছে তাই নিয়ে যাও, এর অতিরিক্ত আর পাবে না।[৮৯]

ইমাম নবভী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন: এখানে তাকওয়া ও সৎ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অভাবী ঋণগ্রস্তকে সাহায্য ও তার জন্য সাদকাহ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।[৯০]

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব

ইসলাম শুধুমাত্র ধনী, সৎকর্মশীলদেরকে ঋণগ্রস্তের সহযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে। ইতিপূর্বে আমরা ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছি। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির লাশ আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তিনি ঋণ পরিশোধের মত কোন অবলম্বন রেখে গেছেন কি? যদি বলা হত তিনি ঋণ পরিশোধের অবলম্বন রেখে গেছেন তবে তিনি জানাযা পড়াতেন, আর না থাকলে সাহাবীদের বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় কর। অতঃপর যখন আল্লাহ মহাবিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন: "আমি মুমিনদের জীবনের চেয়ে অধিকতর হকদার, যদি কেউ ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর যে কোন সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদের জন্য।"[৯১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কারণে এ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পিত হয়। হাফেজ ইবনু হাজের বলেন: এ বৈশিষ্ট্য কি আল্লাহর রাসূলের একান্ত অর্থাৎ তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত নাকি তারপরের সব রাষ্ট্রপ্রধানের উপরও কর্তব্য? অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হল এ দায়িত্ব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধানের উপর চলমান রয়েছে। আর জনকল্যাণ ফা থেকে এ অর্থের যোগান দেয়া হবে।[৯২] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরবর্তী সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ এ বিষয়ে গুরুত্ব

প্রদান করতেন। আবু উবাইদ কাশেম বলেন- উমার বিন আব্দুল আযীয আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান (যিনি ইরাকের গভর্নর ছিলেন) এর কাছে রাষ্ট্রীয় আদেশপত্র লেখেন যে, জনগণের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করে দাও। অতঃপর আব্দুল হামিদ চিঠির উত্তরে লেখেন, আমি তাদের প্রাপ্য দিয়েছি তারপরেও বায়তুলমালে সম্পদ রয়ে গেছে। তার এ চিঠির জবাবে খলিফা লেখেন- অবশিষ্ট অর্থ যে সব ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধের মত সামর্থ্য নেই তাদের জন্য রেখে দাও।[৯৩]

৩. কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করে উত্তরাধিকার বন্টন করা যাবে না

কিস্তি তথা ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপের অন্যতম বিধান এই যে, কেউ ঋণ বা কিস্তি ঘাড়ে নিয়ে মারা গেলে কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। মৃত্যু ব্যক্তির ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশের বর্ণনা দিতে যেয়ে আল্লাহ্ বলেন: ".... (এ হিস্যা বন্টিত হবে) তোমরা কোন অসীয়ত করে গেলে তা পূরণ ও ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পরে।"[৯৪]
আয়াতের তাফসীরে কুরতুবী বলেন: "ঋণ পরিশোধ ও অসীয়ত পূরণের পরে ছাড়া উত্তরাধিকার বন্টন করা যাবে না।"[৯৫]
মৃত কোন ঋণ রেখে গেলে উত্তরাধিকার বন্টনের আগে তা পরিশোধ করতে হবে এমন কি যদি উত্তরাধিকারী নাবালেগ শিশুও হয়। সায়াদ বিন আতওয়াল রা. বলেন, আমার ভাই তিনশত দিনার ও কয়েকজন নাবালেগ বাচ্চা রেখে ইন্তেকাল করেন। আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম দিনারগুলো তার বাচ্চাদের মধ্যে বন্টন করে দেব, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: "তোমার ভাই ঋণের জালে আটকানো, যাও তার ঋণ পরিশোধ কর।" তিনি (সায়াদ) বলেন: আমি যেয়ে তার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করলাম এবং ফিরে এসে বললাম: হে আল্লাহর রসূলুল্লাহ! আমি তার সব ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি, শুধুমাত্র একজন মহিলা দুটি দিনার দাবি করছেন কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন: তাকে দিয়ে দাও, সে সত্যবাদীনী।[৯৬]

৪. ঋণ পরিশোধকে অসীয়তের উপর প্রাধান্য দেয়া

কোন মৃত যদি অনাদায়ী ঋণ বা কিস্তি এবং কোন অসীয়ত রেখে মৃত্যুবরণ করে তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী আগে তার ঋণ শোধ করতে হবে তারপর অসীয়ত পুরণ করতে হবে। যদিও আয়াতে অসীয়তের কথা আগে এসেছে। আলী রা. বলেন: "তোমরা আল্লাহর বাণী (তোমরা কোন অসীয়ত করে গেলে তা পুরণ ও ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পরে) পাঠ করে থাক; আর আল্লাহর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসীয়তের আগে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিতেন।"[৯৭]

আল্লামা ইবনু কাসির বলেন: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আলেম একমত যে, ঋণ পরিশোধ অসীয়ত পূরণের চেয়ে অগ্রগামী।[৯৮]

এভাবেই ইসলাম ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এ বেচাকেনা সংক্রান্ত কতিপয় সন্দেহের অপনোদন

এক: মূল্যবৃদ্ধি ও সুদের মধ্যে পার্থক্য: কিস্তিতে মালামাল বিক্রয় চুক্তির আলোকে ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাংখিত পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং গ্রাহকের কাছে তা বাকিতে বিক্রয় করে। পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে পণ্যের মূল্য তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়সীমা যত বেশি হয় মূল্যও তত বেশি হয়। এক কথায় বলা যায়, কিস্তিতে মালামাল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বাজারদর অপেক্ষা বেশি হয়। তাই এ ক্ষেত্রে কতিপয় সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো অভিযোগ আকারে উত্থাপন হয়েও থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো, কিস্তিতে মালামাল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে দেয়া অবকাশের বিপরীতে পণ্যের নায্যদামের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করা হয় যা মূলত: সুদেরই ভিন্নরূপ। ঋণগ্রহীতার তাৎক্ষণিক ঋণ পরিশোধের অক্ষমতাকে সম্বল করে যেমন সুদ গ্রহণ করা হয়, ঠিক তেমনি ক্রেতা কর্তৃক পণ্যমূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধের অক্ষমতাকে সম্বল করে পণ্যমূল্যে বৃদ্ধি ঘটানো হয় যা দৃশ্যত সুদই। এ প্রসংগে তারা ইবনু আব্বাস রা. বর্ণিত ও ইবনু তাইমিয়া র. উদ্ধৃত হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন: "নগদে কিনে বাকীতে বিক্রয়, টাকা দিয়ে টাকা নেয়ার মত।"[৯৯]

এ অভিযোগের জবাবে বিচারপতি তাকী উসমানী এক প্রাণবন্ত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর "ইসলামিক ফাইন্যান্স" গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ঋণের বিপরীতে প্রদেয় বাড়তি অর্থ এবং বাকিতে বিক্রয়ের কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এককথা নয়।[১০০] এর মূল বিষয় হল, আধুনিক পুঁজিবাদি দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবসায়িক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। পারস্পরিক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার সাথে সমান আচরণ করা হয়। কিন্তু ইসলামী নীতিমালা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে না। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী মুদ্রা (নগদ টাকা) ও পণ্যের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে এগুলোর বিধানও ভিন্নভিন্ন। মুদ্রা (Money) এবং পণ্যের (Commodity) মধ্যে পার্থক্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য (Value) নেই। এর দ্বারা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। বরং এগুলো পণ্য বা সেবা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে পণ্যের নিজস্ব মূল্য (Value) রয়েছে। এগুলোকে অন্য কোন জিনিসে রূপান্তর করা ছাড়াই সরাসরি এ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

২. পণ্য গুণ ও মানের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। পক্ষান্তরে মুদ্রা শুধু মূল্য নির্ধারণ ও আদান-প্রদানের মাধ্যম। এজন্যই মুদ্রার যে কোন মূল্য মানের একটি একক তার আরেকটি এককের একশ' পার্সেন্টের সমান। পাঁচশ' টাকার পুরাতন এবং ময়লাযুক্ত একটি নোট পাঁচশ' টাকার নতুন আরেকটি নোটের একশ' পার্সেন্ট সমতুল্য। অথচ পণ্য বিভিন্ন মানদ ে র হতে পারে। একটি ব্যবহৃত পুরাতন গাড়ির মূল্য একটি নতুন গাড়ি অপেক্ষা অনেক কম হয়।

৩. পণ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি একটি নির্দিষ্ট টার্গেটের উপর হয়, টার্গেটের ভিত্তিতে গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়। যেমন 'ক' যদি একটি নির্দিষ্ট গাড়িকে টার্গেট করে তা ক্রয় করে এবং বিক্রেতা তাতে একমত হয় তবে সেই গাড়িটির ক্ষেত্রেই ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান আরোপিত হয়। বিক্রেতা ঐ গাড়ির পরিবর্তে অন্য আরেকটি গাড়ি নিতে ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে না। যদিও অন্য গাড়িটি একই জাতীয় ও একই মানের হয়। পক্ষান্তরে কোন লেনদেনে মুদ্রা নির্দিষ্ট করা যায় না। 'ক' যদি 'খ' থেকে কোন জিনিস পাঁচশ টাকার একটি নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে ক্রয় করে, তাহলেও সে উক্ত নোটের স্থলে সেই মূল্যমানের অন্য নোট প্রদান করতে পারবে।

৪. আধুনিক লেনদেনে মুদ্রার অস্তিত্বও অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন- ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন যা বর্তমান সময়ে প্লাস্টিক মানি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় কল্পনাহীন।

এসব পার্থক্যকে সামনে রেখে ইসলাম পণ্য ও মুদ্রার সাথে পৃথক পৃথক আচরণ করে। মুদ্রার যেহেতু নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই, তা শুধুমাত্র লেনদেনের মাধ্যম, যার মান ও গুণগত দিক বলতে কিছুই নেই। সে কারণে মুদ্রার একটি একক সেই মূল্যমানের আরেকটি এককের বিনিময়ে শুধুমাত্র সমান সমান হতে পারে। যদি কেউ একহাজার টাকার একটি নোটের লেনদেন করে তবে দ্বিতীয় পক্ষের মুদ্রাও একহাজার টাকার নোটের সমমূল্যের হতে হবে। তবে পণ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নরূপ। কেননা পণ্যের নিজস্ব ভ্যালু রয়েছে এবং পণ্যের মানদ ে ও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ জন্য মালিকের এ অধিকারও রয়েছে যে, চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি অনুযায়ী পণ্য যে কোন মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। বিক্রেতা কোন প্রতারণা, ধোঁকাবাজি বা মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ক্রেতার সম্মতিক্রমে পণ্যকে বাজারদরের চেয়ে অধিক মূল্যেও বিক্রি করতে পারবে। ক্রেতা যদি সেই অতিরিক্ত মূল্যে সন্তুষ্ট হয় তবে বিক্রেতার জন্য এই অতিরিক্ত মূল্য সম্পূর্ণ বৈধ কেননা সেক্ষেত্রে ঐ অতিরিক্ত মূল্য মূল মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নগদ বেচাকেনার ক্ষেত্রে যদি এ বিধান হয় তবে বাকিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

অতএব যখন টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হবে তখন ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক বা বাকিতে হোক কোন অবস্থাতেই কমবেশি করা যাবে না। কিন্তু যখন টাকার বিনিময়ে পণ্য

বিক্রি করা হবে ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক আর বাকিতে হোক তখন উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্য বাজারদরের চেয়ে বেশি হতেও পারবে। পণ্যমূল্য পরিশোধের সময়ের ব্যবধান মূল্য নির্ধারণের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। তবে এটি টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনের মত নয়, কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানের বিপরীতেই হয়ে থাকে। বরং এ মসআলাটি চার মাযহাবের ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, বিক্রেতা যদি কোন জিনেসের নগদ এবং বাকি বিক্রয়ের জন্য পৃথক পৃথক দাম নির্ধারণ করে এবং বাকি বিক্রয়ের মূল্য নগদ বিক্রয়ের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে।

দুই: এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়

এ সম্পর্কে অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি তিনটি হাদীস রয়েছে। আর তা হল:

(১) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

নهى عن بيعتين فى بيعة "রসূলুল্লাহ স. এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[১০১]

(২) সাম্মাক ইব্ন আব্দুর রহমান র. থেকে বর্ণিত,

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة রসূলুল্লাহ স. এক চুক্তিতে দুই চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন।[১০২]

(৩) আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من باع بيعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا যে এক বিক্রয়ে দুই বেচাকেনা করল তার জন্য হয় কম মূল্যেরটি নতুবা সুদ নির্ধারিত হবে।[১০৩]

হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণের মতামত:

উপরিউক্ত হাদীস তিনটির ব্যাখ্যায় হাদীসের ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মত তুলে ধরা ,হলো:[১০৪]

প্রথমত: ইমাম শাফিয়ী এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন: (১) এক বিক্রয়ের সাথে অন্য আরেকটি বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা। যেমন কেউ বলল আমি এই ঘোড়াটি তোমার কাছে ১০০০ টাকার বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করলাম যে তুমি তোমার ঘরটি ২০০০ টাকায় আমার কাছে বিক্রি করবে। (২) আমি এই পণ্যটি নগদে ১০ টাকায় অথবা বাকিতে ২০ টাকায় বিক্রি করলাম।

দ্বিতীয়ত: আল্লামা ইবন কাইয়্যুম বলেন: এর স্বরূপ এমন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি এই পণ্যটি এক বছরের জন্য বাকিতে তোমার কাছে ১০০ টাকায় এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে আমি একবছর পর নগদ ৮০ দিনারে ক্রয় করে নিব। তিনি আরও বলেন, এ ছাড়া উক্ত হাদীসের ভিন্ন কোন অর্থ হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ হাত্তাবী বলেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে এক দিনারের বিনিময়ে একমাস মেয়াদে অগ্রীম (সালাম) এক সা' গম কিনল। অত:পর যখন পণ্য প্রদানের সময় এলো তখন উক্ত ব্যক্তি বিক্রেতা থেকে গম দাবি করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তোমার এই এক সা' গম দুই মাসের জন্য দুই সা' গমের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি কর।

চতুর্থঃ দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনাকারী সাম্মাক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ কোন ব্যক্তি পণ্য বিক্রি করার সময় বলল, এর নগদ মূল্য এত এবং বাকি মূল্য এত। অর্থাৎ নগদ মূল্যের চেয়ে বাকি মূল্য বেশি। এমনকি যদি পক্ষদ্বয় নির্দিষ্ট একটি মূল্য নির্ধারণ করে তবুও এই অর্থ প্রয়োগ হবে। আর এ থেকেই তারা বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য আজকের মূল্যের উপর বৃদ্ধি করাকে অবৈধ বলেন।

পঞ্চমতঃ কেউ কেউ উপরিউক্ত ব্যাখ্যাকে 'অথবা' শব্দের দ্বারা সীমিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে বিক্রেতা বলবে, পণ্যটির মূল্য নগদে এত টাকা অথবা বাকিতে এত টাকা। কিন্তু তারা কোন একটি মূল্য নির্ধারণ না করেই আলাদা হয়ে যায়। আবু উবাইদ, সাওরী, ইসহাক, মালিকী, হাম্বলীগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে এ ব্যাখ্যাটিও করেছেন।

ষষ্ঠতঃ ইমাম মালিক আরও বলেন, এর স্বরূপ হল দিনার (মুদ্রা) বা ছাগী (মূল্যমান) দিয়ে কোন পণ্য ক্রয় করা অথবা দিনারের বিনিময়ে ছাগী (প্রাণী) বা কাপড় (পণ্য) ক্রয় করা। উভয়টির মধ্যে যে কোন একটিকে ক্রেতার উপর চাপিয়ে দেয়া।

হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গি

হাদীসগুলোর ব্যাপারে ফকীহদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাহল তারা হাদীসের ভাষ্যকারদের মতামতের সাথে একমত হয়ে সামান্য বর্ধিত ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। তবে তারা হাদীসগুলো থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত রূপে বেচাকেনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বেচাকেনার অর্ন্তগত। তাছাড়া তাদের মতে, বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করা না হলে সে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। এসম্পর্কে চার মাযহাব, আল্লামা কাসানী, ইব্ন আবিদীন, যায়দিয়্যাহ, ইমামিয়্যাহ, জাহেরিয়্যাহ, আবাদিয়্যাহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতামত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছ। এক্ষেত্রে আল্লামা ইব্ন কুদামা বলেনঃ 'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়' এর দুটি অবস্থা হতে পারে।

(১) কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলল, আমি এই পণ্যটি তোমাকে নগদ ১০ দিনারে অথবা বাকিতে ১৫ দিনারে অথবা অস্থায়ীভাবে ১০ দিনারে অথবা ৯ দিনারে স্থায়ীভাবে বিক্রয় করলাম। এক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য অজ্ঞাত থাকায় এ বেচাকেনা বাতিল সাব্যস্ত হবে।

(২) অথবা সে বলল, আমি এ পণ্যটি এত দিনারের বিনিময়ে এই শর্তের ভিত্তিতে বিক্রয়

করলাম যে, দিনারের মূল্যমান এত যা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম অথবা পণ্য স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করে কিন্তু গ্রহণ করে দিরহাম।[১০৫]

'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়' নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু

হাদীসগুলোর ভাষ্যকার ও ফকীহদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের ঐক্যমতের আলোকে 'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়' নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ

(ক) **বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা:** কেননা নগদ বা বাকি বিক্রয়ের দুটি মূল্যের মধ্যে কোনটিকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ না করেই পক্ষদ্বয় আলাদা হয়ে যায়।

(খ) বেচাকেনার ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া: কেননা উক্ত বেচাকেনা নগদ বেচাকেনা নাকি বাকি বেচাকেনা তা উল্লেখ করা হয় না।

(গ) বিনিময়ের এক দিক অস্পষ্ট থাকে: বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ পদ্ধতিতে বিক্রেতার হক যথাযথভাবে বর্ণিত হয় না।[১০৬]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, কিস্তিতে মালামাল বিক্রয়ের যে নীতিমালা উপরে উল্লিখিত হয়েছে 'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়' এর নিষেধাজ্ঞা সে পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা যে সব কারণে 'এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয়' অবৈধ তার কোনটি কিস্তিতে বেচাকেনার মধ্যে নেই।

তিন: এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই শর্ত

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "অগ্রিম নিয়ে বেচাকেনা, এক বেচাকেনায় দুই ধরনের শর্ত, সংশ্লিষ্ট নয় এমন মুনাফা এবং যা তোমার কাছে বর্তমান নেই তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।"[১০৭] হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি নিয়ে হাদীসের ভাষ্যকরগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন: এটি এমন যে বিক্রেতা বলল, আমি এ পণ্যটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম যদি নগদে হয় তবে ১০০০ টাকার বিনিময়ে আর যদি বাকিতে হয় তবে ২০০০ এর বিনিময়ে। কেউ কেউ বলেন: হাদীসের বাস্তবতা এমন যে, বিক্রেতা বলবে, আমি এই কাপড়টি এত টাকার বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রয় করলাম তবে এর রং ও সেলাই করার দায়িত্ব আমার উপর। বলা হয় এখানে দুই শর্ত বলতে বেচাকেনা সংশ্লিষ্ট একটি শর্ত ও এর বাইরের অন্য কোন শর্তারোপকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বিক্রেতা এ শর্ত করল যে, এ বিক্রয়ের বিনিময় স্বরূপ কিছু দান করা বা কারো কাছে সুপারিশ করা।[১০৮] এ হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ যারা কিস্তিতে বেচাকেনাকে উদ্দেশ্য করেন তাদের জন্য পূর্ববর্তী হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত জবাব প্রজোয্য।

চার: বাঈ ইনা

অনেকে কিস্তিতে বেচাকেনাকে বাঈ ইনা (بيع العينة) এর সাথে তুলনা করেন। কেননা বাঈ ইনার মধ্যেও বাজারদর থেকে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বাঈ ইনার পরিচয়, পদ্ধতি ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক।

বাঈ ইনার পরিচয় ঃ ইনা (عينة) শব্দের ع বর্ণের নিচে যের যোগে অর্থ অগ্রিম। পরিভাষায় বাঈ ইনার বিভিন্ন সংগা পাওয়া যায়। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি তুলে ধরা হলো:[১০৯]

(ক) রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলা হয়েছে: বাকিতে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় যা ঋণগ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধের জন্য বাজারদরে বা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে।

(খ) রাফিয়ী বলেন: কারো কাছে বাকি মূল্যে কোন পণ্য বিক্রয় করে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা। অত:পর তার মূল্য হস্তগত করার পূর্বেই নগদ মূল্যে তা ক্রয় করা যা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম।

অতএব বলা যায় এটি ব্যবসার আকৃতিতে ঋণ যা রিবা আল-ফদল বৈধ করার কৌশল।

বাঈ ইনার স্বরূপ:

হাদীসের ভাষ্যকার ও ফকীহগণ বাঈ ইনার বিভিন্ন স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি পদ্ধতি হল-

ক) ইমাম আহমদ বলেন: কোন ব্যক্তির কাছে যদি অগাধ সম্পদ থাকে কিন্তু সে বাকিতে ছাড়া বিক্রি না করে তবে তার ব্যবসাকে বাঈ ইনা বলা হবে।[১১০]

খ) যার নগদ অর্থের প্রয়োজন এমন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছে এসে দশ দিনার কর্জ চাইলে সে বলল, আমি তোমাকে কর্জ দিতে পারব না তবে তুমি ইচ্ছা করলে আমার থেকে এই কাপড়টি বাকিতে ১২ দিনারে কিনতে পার যার বাজারদর ১০ দিনার। অত:পর ঋণগ্রহনেচ্ছু ব্যক্তি তাতে রাজী হয়ে ১২ দিনারে কাপড় কিনে বাজার দরে ১০ দিনারে বিক্রয় করল। এক্ষেত্রে কাপড়ের মালিক ২ দিনার অতিরিক্ত পেল এবং ঋণগ্রহীতা ১০ দিনার পেল। তবে ঋণ পরিশোধের সময় ১২ দিনার পরিশোধ করতে হবে।[১১১]

গ) এর এমনও পদ্ধতি রয়েছে যে, উপরিউক্ত পদ্ধতির মধ্যে তৃতীয় অন্য একজন প্রবেশ করে। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ ঋণপ্রার্থী বাকিতে ১২ দিনারের বিনিময়ে ২য় ব্যক্তি তথা বিক্রেতা থেকে ক্রয় করে পণ্য কারায়ত্ত করে অতঃপর তা তৃতীয় ব্যক্তিকে নগদ ১০ দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে। অত:পর তৃতীয় ব্যক্তি তা আবার ২য় ব্যক্তিকে একই মূল্যে (১০ দিনার) বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে ১ম ব্যক্তি ১০ দিনার কর্জ পান, ২য় ব্যক্তি ২ দিনার লাভবান হন, কিন্তু ৩য় ব্যক্তি আপাতত দৃষ্টিতে কোন আর্থিক লাভ পায় না। আল-মুহিত গ্রন্থে এ পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে।[১১২]

বাঈ ইনার বিধান

হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহের মতে বাঈ ইনা অবৈধ। শাফিয়ীগণের মতে মাকরুহ। তাঁরা এ বেচাকেনা অবৈধ বা মাকরূহ হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ পেশ করেন। যার মধ্যে যায়িদ ইব্ন আরকামের স্ত্রীর বর্ণার প্রেক্ষিতে আয়িশা রা. উচ্চারিত কঠোর বাণী,[১১৩] রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক বর্ণিত বাঈ ইনার পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অতএব বলা যায়, বাঈ ইনার স্বরূপ কিস্তিতে বেচাকেনার স্বরূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা-

ক) ইনার মধ্যে মূলতঃ নগদ অর্থ অর্জনের ইচ্ছা থাকে বিধায় সেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের উপর বাড়তি আরোপ করা হয়। দ্রব্যমূল্যই থাকে মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু কিস্তি তে বেচাকেনার মধ্যে অর্থ পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার প্রেক্ষিতে দ্রব্যমূল্য বেশি করা হয়।

খ) ইনার বৈধতার বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং অবৈধ বা মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ একমত। কিন্তু কিস্তিতে বেচাকেনা জমহুর আলিমদের মতে বৈধ।

প্রস্তাবনা

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি:

১. কিস্তিতে মালামাল বিক্রয়ের অর্থ বর্তমান কোন পণ্যকে বাকিতে বিক্রয়ের চুক্তি যা নির্ধারিত কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। উসূলে ফিক্বহর নিয়ম অনুযায়ী কিস্তি ও বাকি শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'সাধারণ ব্যাপক-বিশেষ' সম্পর্ক عموم وخصوص বিদ্যমান। অতএব প্রত্যেক কিস্তিই বাকি, কিন্তু বাকি অর্থ পরিশোধ কিস্তিতে হতে পারে আবার কিস্তি ছাড়াও হতে পারে।

২. কিস্তিতে মালামাল বেচাকেনার ক্ষেত্রে সাধারণ বেচাকেনার শর্তাবলি ছাড়াও কতিপয় অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, যেমন:

ক) কিস্তিতে বেচাকেনা যেন কোনভাবেই সুদের উপসর্গ না হয়। কিস্তিতে বেচাকেনা অনেক সময় 'বাঈ ঈনা' হওয়ার মাধ্যমে সুদের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ) বিক্রেতাকে পণ্যের মালিক হতে হবে। অতএব ক্রেতার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিক্রেতা অন্যত্র থেকে পণ্য কিনে পুনরায় তা ক্রেতার কাছে কিস্তিতে বিক্রয় করা বৈধ নয়।

গ) পণ্য বিক্রেতার আয়ত্তাধীনে থাকতে হবে। যে পণ্য কিস্তিতে বিক্রয় করা হবে বিক্রেতা শুধুমাত্র তার মালিক হলে চলবে না বরং বিক্রয়ের পূর্বে উক্ত পণ্য অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে মালিকের আয়ত্তে থাকতে হবে। তা খাদ্য হোক বা অন্য কিছু হোক।

ঘ) কিস্তিতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে মূল্য ঋণ হিসেবে বিবেচ্য হবে, উপস্থিত সম্পদ হিসেবে

নয়। কেননা কিস্তিতে বেচাকেনার মধ্যে মূল্য বাকি থেকে যায়। আর বাকি বা অনাদায়ী অর্থকে ঋণ ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

ঙ) বিক্রিত পণ্য তাৎক্ষণিক হস্তান্তর করা, বিলম্বে নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য হস্তান্তরে বিলম্ব করা হলে بيع الكالئ بالكالئ হয়ে যাবে, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

চ) কিস্তির পরিমাণ, সংখ্যা, মেয়াদ, প্রতি কিস্তি আদায়ের তারিখ ইত্যাদিসহ কিস্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় উভয় পক্ষের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে কোন প্রকার বিবাদের সম্ভাবনা না থাকে।

ছ) কিস্তিতে বেচাকেনা তাৎক্ষণিক কার্যকর হিসেবে গণ্য হবে। অতএব কিস্তির অংক সম্পূর্ণ পরিশোধের পর বেচাকেনা কার্যকর হওয়ার শর্তারোপ বৈধ হবে না।

৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তথা সমসাময়িক আলিমদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কিস্তিতে (বাকিতে) বিক্রয়ের জন্য নগদ দামের চেয়ে বেশি দাম নির্ধারণ করা বৈধ। এমনকি এ বিষয়ে ফকিহগণের ইজমা বা ঐকমত্যও বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন কোন আলিমের ভিন্নমতও রয়েছে।

৪. তড়িৎ পরিশোধের বিপরীতে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা বৈধ। অতএব যদি কেউ কিস্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বেই সমুদয় অর্থ পরিশোধ করে তবে তড়িৎ পরিশোধিত কিস্তির সময়কালের জন্য মূল দামের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয়েছিল তা ফেরত দাবি করতে পারবে।

৫. তড়িৎ কিস্তি গ্রহণ করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না যার কারণে চুক্তিকৃত মূল্যে হ্রাস করতে হয়। কেননা এর কারণে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া মূল্য পরিশোধে বিলম্বিতকরণ উভয়েরই অধিকার। অতএব এ অধিকার থেকে একজনকে বঞ্চিত করার জন্য তার উপর জবরদস্তি করা যাবে না।

৬. সামর্থবান ঋণীর জন্য অনাদায়ী কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে টালবাহানা করা সম্পূর্ণ হারাম। এতদসত্ত্বেও কিস্তি আদায়ে বিলম্ব করার কারণে আর্থিক ক্ষতিপূরণের শর্তারোপ করা বৈধ নয়।

৭. অক্ষম ঋণগ্রস্তের জন্য অনাদায়ী কিস্তি আরও বিলম্বিত করে পরিশোধের শর্তারোপ বৈধ।

৮. কিস্তিতে বেচাকেনার চুক্তিতে অর্থ পরিশোধের বিভিন্ন মেয়াদ ও সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিক্রয়মূল্য থাকতে পারবে না। যেমন গাড়ি বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে যদি এমন থাকে যে এক বছরের জন্য একলক্ষ টাকা, দুই বছরের জন্য একলক্ষ বিশ হাজার, তিন বছরের জন্য একলক্ষ ত্রিশ হাজার ইত্যাদি। বরং এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ও নির্দিষ্ট মূল্যের উপর একমত হতে হবে।

৯. মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে কিস্তির টাকা দাবি করা বিক্রেতার জন্য বৈধ নয়। একইভাবে যদি ক্রেতা মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে কিস্তি পরিশোধ না করে তবে তাকে 'টালবাহানাকারী' হিসেবে গণ্য করা যাবে না। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বা উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া বিক্রেতা কিস্তি পরিশোধের দাবি করতে পারবে না।

১০. ক্রেতা কিস্তির সমুদয় অর্থ পরিশোধ করার আগেই যদি মারা যায় তবে মৃত্যুর কারণে তার চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাবে না। যদি উত্তরাধিকারীরা উক্ত ঋণ কোন জামানত বা বন্ধকের মাধ্যমে সত্যায়ন করে কিস্তি চালিয়ে যেতে চায়। আর যদি উক্ত ঋণ সত্যায়ন না করে তবে তাৎক্ষণিক মেয়াদোত্তীর্ণের ঘোষণা প্রদান করে সমুদয় অর্থ উসুল করতে চাইলে যে সব কিস্তির অর্থ অগ্রিম আদায় করা হচ্ছে তার অতিরিক্ত মূল্য মোট মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে।

১১. কোন কারণে ক্রেতা দেউলিয়া হলে তার বাকি ঋণ ও কিস্তির অর্থ তাৎক্ষণিক আদায় করা হবে না। বরং তার অর্থ অনাদায়ী বর্তমান ঋণের ক্ষেত্রে বণ্টিত হবে এবং বাকি ঋণের অর্থ মেয়াদোত্তীর্ণের সময় পর্যন্ত তার অধিকারে রাখতে পারবে।

১২. কিস্তিতে বেচাকেনার চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রিত পণ্যের মালিকানা ক্রেতা বরাবর চলে যায় এবং মূল্যের মালিকানা থাকে বিক্রেতার কাছে। এ কারণে বিক্রেতার জন্য বৈধ নয় যে, সে কিস্তির বাকি অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত পণ্য আটক রাখবে। যদি বিক্রেতা এ জাতীয় কোন শর্তারোপ করে তবে চুক্তি বাতিল হবে।

১৩. যদি ক্রেতা দেউলিয়া/ নিঃস্ব হয়ে যায় এবং কিস্তিতে ক্রয়কৃত মাল তার কাছে অবশিষ্ট থাকে তবে ক্রেতার অন্যান্য নগদ পাওনাদারের চেয়ে বিক্রেতা ঐ পণ্যের অধিকতর হকদার। এমতাবস্থায় বিক্রিত পণ্যটি হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখতে হবে যতদিন না তার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ না হয়; যদি পণ্য ততদিন আটক থাকে তবে মেয়াদোত্তীর্ণের শেষে বিক্রেতাকে উক্ত পণ্য গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা দিতে হবে। এ হুকুম শুধুমাত্র ঐ সময়ের জন্য যখন বিক্রেতা ঐ পণ্য বাবদ কোন অর্থই গ্রহণ না করে এবং ক্রেতা জীবিত থাকে।

১৪. বিক্রেতার জন্য বৈধ যে সে বিক্রিত পণ্যকে মূল্য পরিশোধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্যারান্টি হিসেবে বন্ধক রাখার শর্তারোপ করবেন।

১৫. কিস্তিতে বেচাকেনা উভয়পক্ষ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে মর্মে কোন পূর্ববর্তী ওয়াদার শর্তারোপ করা বৈধ নয়। কেননা ওয়াদা দিয়ে বাধ্য করা হলে তা একটি স্বতন্ত্র চুক্তি, আর পূর্বকার কোন বাধ্যবাধকতা থাকলে অনেক সময় পরবর্তী চুক্তি অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এ পরিসর সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এ নীতিমালায় যেভাবে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে

একইভাবে বিক্রেতার অর্থনৈতিক ঝুঁকি এড়ানোর যাবতীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। অতএব ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের চলমান অগ্রযাত্রাকে আরও তরান্বিত করতে পারে সেই সাথে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্য দূরীকরণে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানঃ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৪১।
২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৮২
৩. আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী: উমদাতুল কারী, দারুল ফিকর, বৈরুত, সনবিহীন, খ - ১২, পৃষ্ঠা-২২৫
৪. সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং-১৯৬২; (দারু ইব্‌ন কাসীর, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ-৪০৭ হিজরী/১৯৮৭ ইং), খ -২, পৃ-৭২৯।
৫. হাদীস নং-২২৫৫, (প্রাগুক্ত ২/৮৪১)
৬. আল্লামা ইবনু হাজর আসকালানী: ফতহুল বারী শরহে সহীহ আল-বুখারী, (সৌদী এদারাতুল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত, সনবিহীন,) খ -৪, পৃ-৩০২।
৭. সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, হাদীস নং- ২২৮৯; (বিশ্লেষণঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, সনবিহীন), খ -২, পৃষ্ঠা- ৭৬৮।
৮. তিরমিজীঃ হাদীস নং-১৩৫২; (দারুল ফিকর, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ- ১৩৯৯ হি, বিশ্লেষণঃ শেখ আব্দুল ওহাব আব্দুল লতীফ) খ - ৩, পৃ-৬৩৪। আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৫৯৬; (দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, সনবিহীন), ৩/৩৩২। ইব্‌ন মাজাহঃ হাদীস নং- ২৩৫৩; খ - ২, পৃষ্ঠা-৭৮৮।
৯. হাশীয়াহ ইব্‌ন আবিদীন, (দারুল ফিকর, বৈরুত, ২য় প্রকাশ- ১৯৭৯), খ -৪, পৃষ্ঠা-৫৩১।
১০. ড. মুহাম্মদ আতা আস্‌সাইয়্যেদঃ বাই আত্ তাকসীত, (মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা-৬, খ -১, পৃষ্ঠা-(২০৮-২০৯)।
১১. তিরমিযীঃ হাদীস নং- ১৩১৯; খ -৩, পৃষ্ঠা-৬০৯।
১২. ইব্‌ন কুদামাহঃ আল-মুগনী, (মাকতাবাতে রিয়াদ আল-হাদীসাহ, রিয়াদ, সনবিহীন), খ -৪, পৃষ্ঠা- ১৭৭। আরও দ্রষ্টব্যঃ নাইলুল আওতার শরহে মুনতাকা আল-আখবার, (দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৪০২ হিঃ), ৫/১৭২; তাবঈনুল হাকায়েকঃ ৪/৮৭; তাকমিলাতুল মাজমু': ১৩/৬; শরহে আল-খারশীঃ ৪/৬৬।
১৩. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫।
১৪. সূরা আন্ নিসাঃ ২৯।
১৫. ড. ইব্রাহীম আল-দাবুঃ বাঈ আত্ তাকসীত, (মুজাল্লাতুল মাজমা' আল-ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা- ৬, খ -১, পৃষ্ঠা- ২২৯।

১৬. সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮২।
১৭. সহীহ্ বুখারীঃ হাদীস নং- ২৪২৪; খ - ২, পৃষ্ঠা-৯০৪।
১৮. ফাতওয়া ইসলামিয়্যাহঃ ২/২৩৯।
১৯. ইমাম শাওকানীঃ নাইলুল আওতারঃ ৫/১৭২; ড. নিজামুদ্দীন আব্দুল হামীদঃ হুকমু যিয়াদাতুশ শাআর ফীল বাঈ বিন্ নাসিআহ, (মুজাল্লাহ মাজমা' আল-ফিকহ আল-ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা-৬, খ -১, পৃষ্ঠা-৩৭৪; আল্লামা জাস্সাসঃ আহকামুল কুরআন, ২/১৮৬-১৮৭;।
১৯. সূরা আল-বাকারাহঃ ২৭৫।
২০. সূরা আন্ নিসাঃ ২৯।
২১. আবু দাউদঃ হাদীস নং ৩৫০৬; খ -৩, পৃষ্ঠা-৩০৩। তিরমিজীঃ হাদীস নং- ১২৩৪; খ -৫, পৃষ্ঠা-৫৩৫।
২২. তিরমিজীঃ হাদীস নং-১২৩১; (৫/৫৩৩)। মুসনাদে আহমদঃ হাদীস নং-৯৫৮২; (মুআস্সাসাতু রিসালাহ, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ-১৪২০ হি), খ -২, পৃষ্ঠা-৪৩২।
২৩. আল-মুআমালা আল-মাসরাফিয়্যা আর রবুবিয়্যা, পৃষ্ঠা- ১২৫।
২৪. ড. মুহাম্মদ রেযা আল-আনীঃ তাকসীতুদ দাইন ফীল ফিকহিল ইসলামী, (মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ্ আল-ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা-৬, খ -১, পৃষ্ঠা-২৮৫।
২৫. আল-জুআইনীঃ আল-গীয়াছী, পৃষ্ঠা- ২৭৬।
২৬. কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ৫ম প্রকাশ- ১৪০১ হি, খ - ৬, পৃষ্ঠা- ২৩০।
২৭. ড. রফীক ইউনুস মিসরীঃ বাঈ তাকসীতঃ তাহলীল ফিকহী ওয়া ইকতিসাদী, (মুজাল্লাতুল মাজমা আল-ফিকহীল ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা-৬, খ -২, পৃষ্ঠা- ১৯৩।
২৮. ইব্ন কুদামাঃ আল-মুগনী, ৪/৪৫।
২৯. ইব্ন তাইমিয়াঃ তাহজীবুস্সুনান, ৯/৩৪৭।
৩০. সুনানে ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং- ২২৮৯; খ -২, পৃষ্ঠা- ৭৬৮।
৩১. সহীহ্ মুসলিমঃ হাদীস নং ১৬০৪; (সৌদী এদারাতুল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪০০ হি, বিশ্লেষণ- শেখ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী), খ -৩, পৃষ্ঠা-১২২৬।
৩২. আল-কাসানীঃ বাদাঈ' আল-সানাঈ, (মাকতাবাতুল ইমাম, কায়রো, সনবিহীন), খ -৭ , পৃষ্ঠা-৩০৯২।
৩৩. তাদের মতে এ জাতীয় বেচাকেনা বাতিল বেচাকেনার অর্ন্তভুক্ত। যেমন যদি কেউ তার গর্ভবতী উটের বাচ্চা প্রসাবের সময়ের মত অনির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে চুক্তি করে। দ্রষ্টব্যঃ শারহুল কাবীর, খ - ৩, পৃষ্ঠা- ৫৭।
৩৪. রাওদাতুত তালিবীন, খ -৩, পৃষ্ঠা- ৩৯৬।
৩৫. ইব্ন কুদামা 'শারতুল খিয়ার' এর আলোচনা প্রসঙ্গে যায়েদের আগমন, বাতাস প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি ধরনের অনির্ধারিত মেয়াদের জন্য বাকিতে বেচাকেনার চুক্তি অবৈধ বলেছেন। দ্রষ্টব্য- আল-মুগনী, খ - ৩, পৃষ্ঠা- ৫০১।

৩৬. আল-মুগনী, খ -৩, পৃষ্ঠা- ৫১৯।

৩৭. ইবন হাযম: আল-মুহাল্লা, (আল-মাকতাব আত্তিজারী লিততিবাআতি ওয়াত তাওযী', বৈরুত), খ - ৯, পৃষ্ঠা- ৬২৭; আদ্দায়লামী: আল-মারাসিম ফিল ফিকহিল ইমামী, (বিশ্লেষণ: মাহমুদ বোস্তামী, দারুল যাহরা লিত্তিবাআতি ওয়াত তাওযী', বৈরুত), পৃষ্ঠা- ১৭৪; শারহুন নাইল ওয়া শিফাউল আলীল, (মাকতাবাতে আল-ইরশাদ, জিদ্দা, সৌদি আরব, দ্বিতীয় প্রকাশ), খ -৯, পৃষ্ঠা- ৪৫।

৩৮. হাশিয়াহ ইব্ন আবিদীন: ৪/৫৩১।

৩৯. বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী: ব্যবসায়ী কিস্তিতে হালাল পলিসি (অনুবাদ: মাওলানা মাহদী হাসান) মাকতাবাতুল আখতার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৪।

৪০. সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৩।

৪১. বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী: ব্যবসায়ী কিস্তিতে হালাল পলিসি, পৃষ্ঠা- (২০-২২)

৪২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- (২২-২৪)।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪-২০ (সংক্ষেপিত)।

৪৪. ফাতওয়ায়ে হিন্দীয়াহ: ৩/১৫।

৪৫. দ্রষ্টব্য: ব্যবসায়ী কিস্তিতে হালাল পলিসি, পৃষ্ঠা-১৬।

৪৬. ইব্ন কুদামা: আল-মুগনী: ৪/৪২৭।

৪৭. ব্যবসায়ী কিস্তিতে হালাল পলিসি, পৃষ্ঠা-২৭।

৪৮. ড. ফাহাদ আল-রশীদী: লেকচার অন ব্যাংকিং ট্রানজেকশনস ল, ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ- ২১/০৫/২০০৮।

৪৯. ইব্ন মাজাহ: হাদীস নং-২৩৫৯; (২/৭৯০)।

৫০. ড. আলী আল-সালুস, আল-বাঈ বিত্ তাকসিত, (মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী, মক্কা), সংখ্যা-৬, খ -১, পৃষ্ঠা-২৭২

৫১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আল্লামা শওকানী: নাইলুল আওতার, খ -৫, পৃষ্ঠা- ৩১৭।

৫২. ড. মুহাম্মদ রেযা আব্দুল জাব্বার: তাকসীতুদ দাইন ফীল ফিক্হ ইসলামী, (প্রাগুক্ত), পৃষ্ঠা- ১৮১।

৫৩. বায়হাকী: আস্সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১১৪৭১; (মজলিসে দায়িরাতুল মাআরিফ আন্নিজামিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রথম প্রকাশ-১৩৪৪ হি), খ -৬, পৃষ্ঠা-২৮।

৫৪. আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মানসাফের বাবু আররাজুল ইদায়ু মিন হাক্কিহি ওয়া ইতাআজ্জাল-এ এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। দ্র: খ -৮, পৃষ্ঠা- (৭১-৭৫), আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত, ২য় প্রকাশ-১৪০৩ হি।

৫৫. বাবু মা জাআ ফী রিবা আদ্দাইন, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, (মুআস্সাসাতু যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান, দুবাই, প্রথম প্রকাশ-২০০৪ ইং), খ -৪, পৃষ্ঠা-৯৭০।

৫৬. ইব্ন কুদামা: আল-মুগনী. খ - ৪, পৃষ্ঠা- ১৭৪।

৫৭. বায়হাকী: আস্সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১১৪৬৭; খ -৬, পৃষ্ঠা-২৮।

৫৮. ড. মুহাম্মদ রেযা আব্দুল জাব্বার: তাকসীতুদ দাইন ফীল ফিক্হ ইসলামী, (প্রাগুক্ত), পৃষ্ঠা-১৮১; বিচারপতি তাকী উসমানী: ব্যবসায়ী কিস্তিতে হালাল পলিসি, পৃষ্ঠা- (৩৯-৫১)।
৫৯. সহীহ বুখারী: হাদীস নং-২২৮৬; খ -২, পৃষ্ঠা-৮৫১।
৬০. সূরা নিসা: ৫৮
৬১. ইমাম সুয়েতী: আল-ইকলীল ফি এসতেনবাতিত তানযীল, (বিশ্লেষণ: সাইফুদ্দীন আব্দুল কাদের, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ-১৪০১ হি), পৃ- ৯৪।
৬২. সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ২২৫৮; খ -২, পৃষ্ঠা-৮৪১।
৬৩. আল্লামা আইনী: উমদাতুল ক্বারী, খ -১২, পৃ-২২৯।
৬৪. তিরমিযী: হাদীস নং- ১৩১৯; খ -৩, পৃষ্ঠা-৬০৯।
৬৫. সহীহ মুসলিম: হাদীস নং-১৬০০।
৬৬. সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ২২৬৪; খ -২, পৃষ্ঠা-৮৪৩।
৬৭. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯।
৬৮. ইমাম ইলকিয়া আল-হারাস: আহকামুল কুরআন, (বিশ্লেষণ: মুসা মুহাম্মদ আলী ও ড. ইজ্জত আলী, দারুল কুতুব আল-হাদিছাহ, কায়রো, মিশর, সনবিহীন), খ -১, পৃষ্ঠা-৩৬৩।
৬৯. সহীহ বুখারী: হাদীস নং-২২৭০; ২/৮৪৫।
৭০. আল্লামা ইবনু হাজর আসকালানী: ফতহুল বারী, খ -৪, পৃষ্ঠা-৪৬৫।
৭১. উমদাতুল কারী, খ -১২, পৃষ্ঠা-১১০।
৭২. সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ২১৭৬, (২/৮০৫); সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফারায়েজ, হাদীস নং-১৬১৯।
৭৩. ইমাম নব্বী: শরহে নববী আলা মুসলিম, (দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০১ হি:), খ - ১১, পৃ-৬০।
৭৪. তিরমিজী: হাদীস নং- ১০৭৮; খ -৩, পৃষ্ঠা-৩৮৯।
৭৫. সুনানে নাসায়ী: হাদীস নং-৬২৮১; (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হি), খ -৪, পৃ-৫৭।
৭৬. ইব্‌ন কুদামা: আল-মুগনী, খ -৪, পৃ-৫০৫।
৭৭. হাদীসটি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নেসাপুরী তার 'আল-মুসতাদরেক আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (দারুল কিতার আল-আরাবী, বৈরুত, সনবিহীন)। খ -২, পৃ-৫৮। ইমাম হাকেম বলেন: ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, যদিও তারা হাদীসটি নির্গমণ করেননি। ইমাম জাহাবী তার সাথে ঐকমত্য স্থাপন করেছেন। দ্রষ্টব্য: যাহাবী: তালখীস আল-মুসতাদরিক (দারুল কিতাব আল-আরবী, বৈরুত, সনবিহীন, আল-মুসতাদরিক সহকারে), খ -২, পৃ- ৫৮-৫৯।
৭৮. আল্লামা সেনআনী: সুবুলুস সালাম শরহে বুলুগুল মারাম, (মাকতাবাতে আতেফ, কায়রো, সনবিহীন), খ -৩, পৃ- ৮২৮।
৭৯. মুদাব্বার বলা হয় ঐ দাসকে যে তার মালিকের মৃত্যুর পর আজাদ হওয়ার ঘোষণা পেয়েছে।

৮০. আহমদ আব্দুর রহমানঃ আল-ফাতহুর রব্বানী লি তারতীব মুসনাদ লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, (দারুল শিহাব, কায়রো, মিশর, সনবিহীন), খ -১৫, পৃ-৯৩।
৮১. সুনানে আবু দাউদঃ হাদীস নং-৩৬৩০, (৩/৩৪৯); সুনানে নাসায়ীঃ হাদীস নং-৬২৮৮, (৪/৫৯); ইব্‌ন মাজাহঃ হাদীস নং-২৪২৭, (২/৮১১); আল-ফাতহুর রব্বানীঃ ৫/১০১।
৮২. ইব্‌ন আবি শায়বাঃ মাসনাফ, (দারুস সালফিয়া, বোম্বে, ভারত, প্রথম প্রকাশ-১৪০২ হি), খ -৭, পৃ-৭৯।
৮৩. আল্লামা আইনীঃ উমদাতুল ক্বারী, ১২/২৩৬।
৮৪. আবু সোলায়মান আল-খাত্তাবীঃ মাআলিমুস সুনান, (আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৪০১হি), খ -৪, পৃ-১৭৯।
৮৫. ইবনু কুদামাহঃ আল-মুগনী, খ-৪, পৃ-৩০৪/৩০৫।
৮৬. সূরা আল-তওবাহঃ ৬০।
৮৭. ইমাম কুরতুবীঃ আল-জামে লি আহকামুল কুরআন, (দারু ইয়াহইয়াউত্তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, সনবিহীন), খ -৮, পৃ-১৮৩।
৮৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত, হাদীস নং-১৫৫৬।
৮৯. শরহে মুসলিমঃ খ-১০, পৃ-২১৮।
৯০. সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং- ২১৭৬, (২/৮০৫); সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফারায়েজ, হাদীস নং-১৬১৯।
৯১. ফাতহুল বারীঃ ১২/১০।
৯২. ইমাম আবু উবাইদ আল-কাশেমঃ কিতাবুল আমওয়াল (দারুল ফিকর, কায়রো, মিশর, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০১ হি, বিশ্লেষণঃ শেখ মোহাম্মদ খলীল হারাস), বাবু তা'জিল এখরাজ আল-ফাই ওয়া কিসমাতুহু বাইনা আহলিহি, বর্ণনা নং-৬২৫, পৃ-২৩৪।
৯৩. সূরা আন নিসাঃ ১২।
৯৪. তাফসীরে কুরতুবীঃ ৫/৬১।
৯৫. ফাতহুর রাব্বানী লি তারতীব মুসনাদে ইমাম আহমাদঃ কিতাবুল করদ ওয়াদ দাইন, ১৫/৯১; ইবনু মাজাহঃ হাদীস নং-২৪৩৩, (২/৮১৩)।
৯৬. ফাতহুর রাব্বানী লি তারতীব মুসনাদে ইমাম আহমাদঃ কিতাবুল করদ ওয়াদ দাইন, ১৫/৯১; ইবনু মাজাহঃ হাদীস নং-২৭১৫, (২/৯০৬)।
৯৭. মুখতাসারে তাফসীরে ইবনে কাসিরঃ (সংক্ষেপন ও টিকাঃ মুহাম্মদ আলী সাবুনী, দারুল কুরআনুল কারীম, বৈরুত, সপ্তম প্রকাশ-১৪০২ হি), খ -১, পৃষ্ঠা-৩৬৩।
৯৮. ইবনু তাইমিয়াঃ মাজমু' ফাতওয়া, (বিশ্লেষণঃ আনওয়ার আল-বায, দারুল ওয়াফা, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৫ইং), খ -২৯, পৃষ্ঠা- ৪৪৬ ।
৯৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানীঃ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান, অনুবাদ মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ-২০০৮, পৃষ্ঠা- (১০৫-১১২)

১০০. তিরমিজীঃ হাদীস নং- ১২৩১; খ -৫, পৃষ্ঠা-৫৩৩। মুসনাদে আহমদঃ হাদীস নং-৯৫৮২; খ -২, পৃষ্ঠা-৪৩২।

১০১. মুসনাদে আহমদঃ হাদীস নং-৩৭৮৩; মুআস্সাসাহ রিসালাহ বৈরুত, ৩য় প্রকাশ-১৪২০ হি, খ -৬, পৃষ্ঠা-৩২৪।

১০২. সুনানে আবু দাউদঃ হাদীস নং-৩৪৬৩; খ -৩, পৃষ্ঠা-২৯০।

১০৩. এ অংশটি মাওসুআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহঃ (আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুয়েত) খ -৯, পৃষ্ঠা-(২৬৪-২৬৬) থেকে সংক্ষেপিত।

১০৪. আল-মুগনীঃ ৪/১৭৭।

১০৫. তদেব।

১০৬. আবু দাউদঃ হাদীস নং ৩৫০৬; খ -৩, পৃষ্ঠা-৩০৩। তিরমিজীঃ হাদীস নং- ১২৩৪; খ -৫, পৃষ্ঠা-৫৩৫।

১০৭. সুবুলুস্সালাম শরহে বুলুগুল মারামঃ ৩/১৬।

১০৮. মাওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহঃ ৯/৯৬।

১০৯. আদ্ দরদীরঃ আশ্শরহ আল-কাবীর, (মাতবাআতে ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, বৈরুত, সনবিহীন), ৪/৪৫।

১১০. ইব্ন আবিদীনঃ ৫/২৭৩।

১১১. তদেব।

১১২. সুনানে বায়হাকীঃ হাদীস নং- ১০৫৮০; খ -৫, পৃষ্ঠা-৩৩০। মাসনাফে আব্দুর রাজ্জাকঃ হাদীস নং- ১৪৮১৩; খ -৮, পৃষ্ঠা-১৮৫।

১১৩. সুনানে আবু দাউদঃ হাদীস নং- ৩৪৬৪; খ -৩, পৃষ্ঠা-২৯১।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন-২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা : ৬৭-৭৪

বাংলাদেশে বিদ্যমান যেসব বিধান কুরআন-হাদীস বিরোধী

মুহাম্মদ মূসা

আমাদের দেশে যাঁরা রাজনীতি করেন বা যেসব রাজনৈতিক দল আছে, তাঁরা বলেন যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে কুরআন-হাদীস বিরোধী কোনো আইন করা হবে না। ক্ষমতায় গিয়েও কিছু দিন তারা একথা বলেন। আলেম-উলামার প্রতিনিধি দল তাদের সাথে সাক্ষাত করলে তখনো তাঁরা উপরোক্ত কথা বলে আলেমগণকে আশ্বস্ত করেন। আমার প্রশ্ন, তাহলে বাংলাদেশে কার্যকর সরাসরি কুরআন-হাদীস বিরোধী আইনসমূহ কারা প্রণয়ন করেছেন, পাস করেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন?

নির্দিষ্ট কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন ও তা মান্য করার মাধ্যমে ধর্ম অস্তিত্ব লাভ করে এবং ধর্মানুসারীর এক একটি গোষ্ঠীও অস্তিত্ব লাভ করে। ইহুদীরা তাওরাতে, খৃষ্টানরা তাওরাত ও ইনজীলে, মুসলমানরা আল-কুরআনে, বৌদ্ধরা ত্রিপিটকে এবং হিন্দুরা বেদ-পুরাণে বিশ্বাস স্থাপন করে ও স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ পালন করে এক একটি ধর্ম সম্প্রদায়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ও বিকশিত হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রীয় বিধিমালা দ্বারা এসব ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। এখন কোনো রাষ্ট্রীয় আইন যদি ধর্মীয় আইনের স্থান দখল করে তবে সেটি ধর্মীয় আইন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না এবং সংশ্লিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় আইনটি পালন করলে সে ততোটুকু পরিমাণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, গুনাহগার হয় এবং পরিণামে পরকালে শাস্তিযোগ্য হয়।

ধর্ম-সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ উম্মত গঠিত হয়েছে কুরআন ও হাদীসের বাণীতে বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন ও কর্ম পরিচালনার মাধ্যমে। তাদের সামগ্রিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় আইনে এই বিশ্বাস ও কার্যক্রম পরিত্যক্ত হলে তারা আর মুসলমান থাকে না। এখন দেশে প্রচলিত কোনো আইন সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে হলে এবং মুসলমানরা তা মান্য ও পালন করলে তারা ততোটুকু পরিমাণে কুরআন-হাদীস থেকে বিচ্যুত হলো। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হবে যা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

নরহত্যা

মানবজীবন ও তার দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধসমূহ ইসলামী দণ্ডবিধির 'কিসাস' অধ্যায়ের অধীনে আলোচিত হয়েছে। কোনো অপরাধী কোনো মানুষের জীবন অথবা দেহের যতোটুকু ক্ষতিসাধন করবে ঠিক ততোটুকু ক্ষতিসাধন করা হবে অপরাধীর জীবন ও দেহের। একেই বলে কিসাস; অর্থাৎ সমান প্রতিশোধ। এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিধান সরাসরি কুরআর ও হাদীসে বিবৃত হয়েছে। নরহত্যার শাস্তি ইসলামী বিধানে মৃত্যুদণ্ড (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮); বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনেও মৃত্যুদণ্ড (দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারা)। সাক্ষ্য-প্রমাণে ক্রুটি বা অন্য কোনো কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হলে অপরাধী বিজ্ঞ বিচারকের সুবিবেচনায় (দণ্ডবিধিতে অনুমোদিত) ভিন্নতর শাস্তিভোগ করবে (ইসলামী দণ্ডবিধির তা'যীরের আওতায়)।

হত্যাকারীকে ক্ষমা প্রসঙ্গ

কুরআনের বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার স্বীকৃত।

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.

"কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার প্রাপ্য পরিশোধ করা বিধেয়" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)।

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিঃশর্তভাবে অথবা অর্থকড়ি, জায়গা-জমি ইত্যাদি প্রদানের শর্তে হত্যাকারীদের ক্ষমা করার অধিকার রাখে। এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অপরাধীকে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার এ অধিকার বহাল থাকে। উপরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের একজনও যদি অপরাধীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেয় তবে অন্যদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করা সত্ত্বেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না। তারা অপরাধীর নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাভ করবে (ইসলামী দণ্ডবিধির দিয়াত অনুচ্ছেদ দ্র.)।

বিচারকের সুপারিশ

ইসলামী দণ্ডবিধির আওতায় বিজ্ঞ বিচারক নরহত্যার অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সরাসরি ও প্রকাশ্য আদালতে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অনুরোধ করতে পারেন, এমনকি তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনুরোধ অব্যাহত রাখতে পারেন।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ

جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ اَتَعْفُوَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اَتَعْفُوَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذهَبْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ اَمَا انَّكَ انْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَانَا رَاَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.

"ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় গলায় চামড়ার রশি বাঁধা এক হত্যাকারীকে উপস্থিত করা হলো। নবী স. নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ডেকে বলেন, তুমি কি ক্ষমা করবে? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি কি দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি কি মৃত্যুদণ্ড দিবে? সে বললো, হাঁ। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। সে যখন যেতে উদ্যত হলো তখন মহানবী স. আবার বলেন, তুমি কি ক্ষমা করবে? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি কি মৃত্যুদণ্ড দিবে? সে বললো, হাঁ। তিনি নির্দেন দিলেন, একে নিয়ে যাও। মহানবী স. এভাবে তিনবার সওয়াল জওয়াব করেন। চতুর্থবারে তিনি বলেন, শোনো! তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দিতে তাহলে সে নিজের পাপ এবং তার সাথীর (নিহতের) পাপ নিজের উপর চাপাতো। একথায় সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। রাবী বলেন, আমি তাকে চামড়ার রশি টানতে টানতে চলে যেতে দেখেছি" (আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত। বাব ৩, ৪৪৯৯ নং হাদীস)।

এর পূর্ববর্তী (৪৪৯৮ নং) হাদীসে আছে– লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র শপথ, তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। রাসূলুল্লাহ স. বাদীকে বলেন, শোনো! সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং তারপরও তুমি তাকে হত্যা করো– তাহলে তুমি দোযখে যাবে। অতঃপর তাকে খালাস দেয়া হয়।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে হত্যাকারীর সাথে আপোষরফা করার বা তাকে ক্ষমা করার সুপারিশ করার বা ক্ষমা করার কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত নেই (ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দণ্ডবিধি একইরূপ)। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ৪৯ নং অনুচ্ছেদে আছে–"কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।" উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আওতায় 'রাষ্ট্রপ্রধান' অপরাধীর যে কোন দণ্ড হ্রাস, স্থগিত বা ক্ষমা করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাণভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট

আবেদন করলে তিনি তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী অপরাধীর প্রাণদণ্ড মওকুফ করতে বা বেকসুর খালাস দিতে পারেন। (দণ্ড মওকুফের আবেদন করা ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য শর্ত কিনা বা রাষ্ট্রপ্রধান সরাসরিই ক্ষমা করতে পারেন কিনা তার ব্যাখ্যা সর্বোচ্চ আদালতই দিতে পারেন)। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিধানমতে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন দেশের সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি ইচ্ছা করলে বিচারকের যে কোনো রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

এখানে অন্যান্য অপরাধীসহ হত্যাকারীকে ক্ষমা করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে নয়। এই অংশটুকু কুরআন ও হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামী বিধানমতে রাষ্ট্রপ্রধান কেবল সেই হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারেন– যে ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিস বা অভিভাবক নেই। রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ اَنَا وَلِيُّ مَنْ لاَّ وَلِيَّ لَهُ.

"যার অভিভাবক নেই আমি তার অভিভাবক।"

(আরো দেখুন এই জার্নালের জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮ সংখ্যায় একই লেখকের নিবন্ধ)।

বিবাহ সংক্রান্ত

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে এমন কতক বিধান রয়েছে–যা এক বিবেচনায় মান্য বা পালন করা একান্ত জরুরি এবং অপর বিবেচনায় তা মান্য বা পালন করা জরুরি নয়। উদাহরণস্বরূপ ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ.

"নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে তাকে বিবাহ করো–দুই, তিন অথবা চারজন" (সূরা নিসা ঃ ৩)।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন দু'জন, তিনজন বা চারজন নারীকে। (এক) বিবাহ করার এই নির্দেশ পালন বাধ্যতামূলক নয়। কেউ ইচ্ছা করলে সারা জিন্দেগীও অবিবাহিত থাকতে পারে। (দুই) কোনো ব্যক্তি একই সাথে সর্বাধিক চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে এবং চারজন স্ত্রী গ্রহণও তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সে কখনো একই সাথে চার-এর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। এটি হলো আল্লাহর নির্দেশের বাধ্যতামূলক দিক। এই নির্দেশ লংঘনকারী শরীয়তের বিধানমতে দণ্ডযোগ্য অপরাধী।

একইভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বাল্য বিবাহের অবকাশ রেখেছেন (দ্র. সূরা তালাক ঃ ৪)। এখানেও ছেলে-মেয়েদের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেয়া অভিভাবকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। শরীয়তের বিধানমতে তিনি তাদের এই

বয়সে বিবাহ দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে এই প্রকৃতির আরো বিধান রয়েছে যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে মান্য করা জরুরি এবং অপর দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, আল-কুরআন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ও বাল্য বিবাহকে নিঃশর্তভাবে অনুমোদন করেছে। কিন্তু ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা কুরআনের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। এখান থেকে মুসলমানরা কুরআন থেকে এক ধাপ বিচ্যুত হলো। উক্ত অধ্যাদেশের বাংলাদেশ সংস্করণেও তা বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়া আইনের ভাষার প্রয়োগের কিছুটা ত্রুটি আছে, অসংগতি ও আছে। যেমন ঃ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-এর ৬ নং ধারার শিরোনাম দেয়া হয়েছে "বহুবিবাহ"। ইসলামী শরীয়তে একই সাথে বহু সংখ্যক স্ত্রী রাখা সম্পূর্ণ বেআইনী। 'চার' সংখ্যাটি 'বহু' নির্দেশক নয়। অতএব 'বহুবিবাহ' স্থলে 'একাধিক বিবাহ' বা 'একাধিক স্ত্রী গ্রহণ' শিরোনাম প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। ৬ নং ধারার বক্তব্য হলো–একজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে যথানিয়মে সরকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। যদি অনুমতি গ্রহণ না করেন তবে তিনি ৬(৫)(খ) ধারা মোতাবেক এক বছর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড ভোগ করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যে বিবাহের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন, এই আইনে সেই বিবাহটি সঠিক (সহীহ), তা বহাল থাকবে, বাতিল গণ্য হবে না এবং যে স্ত্রী লোকটি তার অপরাধ কর্মে সহযোগিতা করেছেন তাকে নির্দোষ বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কুরআন একই সাথে সর্বাধিক চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। রাসূলে পাক স.-এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ তেরো শতাধিক বছরের মধ্যে মুসলিম আইনবেত্তাগণ (মুজতাহিদ ফকীহগণ)-এর কেউই উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্ত্রীর বিদ্যমানতায় সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে পুনর্বিবাহ করাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য করেননি। এমনকি উপমহাদেশের বিশ শতকের তাফসীরকার ও ফকীহগণও আজ পর্যন্ত অনুরূপ কোনো মত ব্যক্ত করেননি। তাই নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, ইসলামী শরীয়া আইন মোতাবেক রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কোনো অপরাধই নয়।

দ্বিতীয়ত, একটি অপরাধ সংঘটনে যতোজন জড়িত থাকে তাদের সকলেই অপরাধী ইসলামী আইনেও– দেশীয় আইনেও। অথচ এখানে একপক্ষ অপরাধী। এটি একটি অসঙ্গতি।

তৃতীয়ত, বিবাহকারীর জেল-জরিমানা হলেও অপরাধমূলকভাবে অনুষ্ঠিত বিবাহটি বহাল থাকে–বাতিল হয় না, এর কোনো আইনগত ভিত্তিই নেই, যাকে আমরা

আন-নিকাহুল বাতিল শিরোনামে ইসলামী আইনের কিতাবাদিতে লক্ষ করি।

চতুর্থত, আগে ছিল পরিবারে দুইজন (স্বামী-স্ত্রী), দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের কারণে এখন হয়েছে তিনজন। সংসারের ব্যয়ভার বেড়েছে। এদিকে দ্বিতীয় বৌ আনার কারণে দুই নারীর স্বামীকে এক বছর কারাবাসে থাকতে হবে। এদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কে করবে? দুই মহিলা কি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরবে? এসব দিক বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট ধারার অসঙ্গতি দূর করে তার পুনর্বিন্যাস করার আবেদন জানাচ্ছি।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবকাশ রাখার সাথে সাথে আল-কুরআন সতর্ক করে দিয়েছে- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .

"যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন" (সূরা নিসা ঃ ৩)।

অতএব ৪:৩ আয়াতের আলোকে ইসলামী শরীয়তের স্পীরিট হচ্ছে একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা। যদি কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে সেখানে শরীয়তের বিচার্য হলো আদল-ইনসাফ হচ্ছে কিনা। ইসলামী আইন এখানে হস্তক্ষেপ করবে। এর আগে নয়।

তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)

আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ (হাদীস) ইসলামী আইনের অধীনে তালাকেরও একটি অনুচ্ছেদ যোগ করেছে সুবিস্তৃত বিবরণসহ। তালাককে হাদীসে বলা হয়েছে সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ কাজ এবং একান্ত ঠেকায় না পড়লে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

তালাক বাচনিক, লিখিত, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে যেভাবেই দেয়া হোক তা সাথে সাথে কার্যকর হয়। শাফিঈ মাযহাবে তালাকের পক্ষে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক এবং হানাফী মাযহাবে উত্তম (মুস্তাহাব)।

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-এর ৭নং ধারায় তালাক-এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলে সাথে সাথে লিখিতভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাবে এবং তার একটি কপি তালাকপ্রাপ্তাকেও দিবে। তালাক দেয়ার পর কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করলে শাস্তি এক বছরের কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তি। উপধারা ৭(৩)-এ বলা হয়েছে যে, যেদিন সরকারী কর্তৃপক্ষকে তালাক সম্পর্কে অবহিত করা হবে সেদিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না।

উপরোক্ত ৭(৩) উপধারার ভাষাগত ত্রুটির কারণে তা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। ভাষায় বলা হয়েছে, চেয়ারম্যানকে জানানোর দিন থেকে ৯০

দিনের মাথায় তালাক কার্যকর হবে। অথচ তালাক দেয়ার সাথে সাথেই তা কার্যকর হয়, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং স্বামী-স্ত্রী একত্রে মিলিত হতে পারে না। অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের জন্য হারাম হয়ে যায়। অতএব উপধারাটির ভাষাগত সংশোধন জরুরি। তা এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে। তালাক দানের পরবর্তী তিনটি মাসিক ঋতুকাল পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে না।

উপধারা ৭(৫)-এ বলা হয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়া হলে গর্ভখালাস অথবা ৯০ দিন-এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে যে মেয়াদটি পরে শেষ হবে–সেটিই হবে তার ইদ্দতকাল।

এ উপধারাটি সরাসরি কুরআন মজীদের বিরোধী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَاُولاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

'এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' (সূরা তালাক ঃ ৪নং আয়াত)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষেত্রভেদে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল কুরআন মজীদে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মেয়াদ নির্ধারণ করেছে। উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে–গর্ভবতীর ইদ্দতকাল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত–তা এক ঘণ্টাও হতে পারে আবার দশ মাসও হতে পারে। স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণেও তার ইদ্দতকাল একইরূপ। [রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণীর জন্য অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসহ দ্র. নাসাঈ শরীফ, কিতাবুত তালাক, বাব ইদ্দাতিল হামিল আল-মুতাওয়াফ্ফা আনহা যাওজাহা]।

(২) যে নারীকে বিবাহ করার পর স্বামী-স্ত্রীর একান্তবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে তার তালাকও উপধারা ৭(৩) মোতাবেক নব্বই দিন পর কার্যকর হবে (আগেই বলা হয়েছে যে, ভাষাগত ত্রুটি আছে)। অথচ কুরআন মজীদের বক্তব্য উপরোক্ত তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে নিম্নরূপ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানদার নারীদের বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ (একান্তে বসবাস) করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই" (সূরা আহ্যাব, ৪৯ নং আয়াত)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার বিধান মোতাবেক উক্ত নারী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরপরই ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু ৭(৩) উপধারা তাকেও কুরআন মজীদের বিপরীতে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা গর্ভবতী ও উপরোক্ত নারীক যে অধিকার প্রদান করেছেন তা মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়েছে।

৭(৩) উপধারাটি কেবল দুই শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে–(এক) যে নারীর (নাবালেগ হওয়ার কারণে) মাসিক ঋতু শুরু হয়নি এবং (দুই) যে নারীর (বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে) মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—

وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ.

"তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি তাদেরও" (সূরা তালাক : ৪)।

সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল তালাক দেয়ার পর থেকে তিনটি মাসিক ঋতু শেষ হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ.

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিনটি মাসিক ঋতুকাল প্রতীক্ষায় থাকবে"(সূরা বাকারাঃ ২২৮)। তিনটি মাসিক ঋতুতে ৯০ দিন নাও হতে পারে। যেমন কোনো নারীকে তার পবিত্র অবস্থা চলা কালে তালাক দেয়ার দু'দিন পরই তার মাসিক হলো। এক মাসের মাথায় আবার দ্বিতীয় মাসিক হলো, আবার এক মাসের মাথায় তৃতীয় মাসিক হলো। এ হিসেবে তিনটি মাসিক অতিবাহিত হতে দুই মাস তিন/চার দিন বা আনুমানিক ৬৪ দিন লাগলো। কুরআন মজীদের নির্দেশ মোতাবেক তার বাধ্যবাধকতা ৬৪ দিনের মাথায় শেষ হয়ে গেলো। সে কোন অপরাধে আরো এক মাস বন্দী থাকবে?

অতএব এসব দিক বিবেচনা করে উপরোক্ত বিধিমালায় অচিরেই সংশোধন আনয়ন করা উচিত। আল্লাহর কিতাবের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই। কেউ তা করলে সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হলো।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ অথবা ঈমানদার নারীর সেই বিষয়ে ভিন্নতর ফয়সালা করার এখতিয়ার নেই। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টত পথভ্রষ্ট হলো" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৮৮

ভূমিকর : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

॥ এক ॥

উপমহাদেশে ভূমি বা তার উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর প্রাচীনকাল থেকে সুবিদিত। বৈদিক যুগের (খ্রি.পূ. ২০০০-১৫০০ অব্দ) প্রথম দিকে রাজশক্তি সুগঠিত ছিল না বিধায় কর আরোপ ছিল সাময়িক ও ঐচ্ছিক। দেবতাদের কৃপা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় অর্পিত কিছু উৎসর্গ করার অর্থে বালি[১] শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যা পরবর্তীতে কম বেশি স্বেচ্ছায় রাজাকে প্রদত্ত উপহার ও কর বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। বৈদিক যুগের শেষ দিকে কর আরোপের প্রকৃতি বদলে যায় এবং রাজাকে প্রজাদের খাদক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কৌটিলিয়ে অর্থশাস্ত্র[২] (আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩২১-৩০০ অব্দ) অনুসারে তৎকালীন সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তা সমাহর্তা সাতটি স্থান পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। এ সাতটি স্থান ছিল দুর্গবেষ্টিত নগরী, গ্রামাঞ্চল, খনি, সেচ, বন, পশুপালন এবং বাণিজ্য পথ। এগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চল ছিল ভূমির উপর প্রযোজ্য কতিপয় করের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভারতের মুসলিম শাসন আমলে (১২০১-১৭৫৭) প্রাচীন কালের ভূমির উপর করারোপের পদ্ধতির তেমন পরিবর্তন হয়নি, তবে করের পরিমাণ কখনও উৎপন্ন পণ্যের এক তৃতীয়াংশে, কখনও বা অর্ধাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বৃটিশ শাসনামলেও (১৭৫৭-১৯৪৭) ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতের সনাতনী ভূমিকর ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়। ব্রিটিশরা জমিদার সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে। সাধারণত উৎপাদিত পণ্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হতো, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর আদায় ছিল দমনমূলক এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেকেরও বেশি কর হিসাবে আদায় করা হতো। ১৭৯৩ খ্রি. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে বাংলায় জমিদারদের জন্য কর হার নির্ধারণ করে দেয়া হয় ১১ ভাগের ১ ভাগ। ১৯৫২ সনে জমিদারি প্রথা বাতিল হলেও বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ সন থেকে। স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি জমি থেকে সরকারের রাজস্ব চাহিদা ছিল একর প্রতি ৬.৪৭ টাকা, এর মধ্যে ৩.৭৫ টাকা ভূমি রাজস্ব এবং ২.৭২ টাকা অন্যান্য কর (উন্নয়ন ও ত্রাণ কর এবং স্থানীয় অভিকর)। ১৯৭২ সনে সরকার রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ২৫ বিঘা (৮.৩৩ একর) পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব মওকুফ করে দিলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাড্ডা আলাতুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

ভূমির মালিকদের অন্যান্য কর হিসাবে একর প্রতি ২.৭২ টাকা এবং ২৫ বিঘার অধিক জমির মালিকদের পূর্বের মত একর প্রতি মোট ৬.৪৭ টাকা ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর বাবদ দিতে হতো। ১৯৭৬ সনে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারি করে ভূমির উপর প্রযোজ্য সব ধরনের করকে একীভূত করে ভূমি উন্নয়ন কর নাম দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর পর ভূমি রাজস্ব আদায়কারী অফিসসমূহের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর ব্যাপক হ্রাসের ফলে ভূমি রাজস্ব আদায়ও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ১৯৭২-৭৩ সনে ভূমি রাজস্ব ছিল মাত্র ২.৫ কোটি টাকা (মোট করের ১.৫%)। এরপর টাকার অংকে ভূমি রাজস্ব ক্রমেই বেড়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সনে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৬১.৪ কোটি টাকা (মোট করের ১.১%) এবং ২০০১-০২ সনের মূল বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২৩৩ কোটি টাকা মোট করের ১.১%।[৩] অত্র প্রবন্ধের শুরুতে আমরা করের সংজ্ঞা, কুরআনুল কারীমে ভূমি কর, আল হাদীসে ভূমি কর, জাহেলিয়া যুগে ভূমি কর আদায়ের বিশেষ পন্থা সমূহ, তায়েফে ভূমি কর আদায়ের পন্থা, মদীনায় ভূমি কর আদায়ের পন্থা, মহানবী স. কর্তৃক ভূমিকরের হার নির্ধারণ, খলীফাদের আমলে খাজনার হার, কর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে আলোচনার পর ভূমিকর (প্রাচীন যুগ), ভূমিকর (সুলতানী আমল), ভূমিকর (মোগল আমল), ভূমিকর (নবাবি আমল) নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কর

কর সরকারী রাজস্বের একটি প্রধান উৎস, যদ্বারা দেশের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যার মাধ্যমে দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন, মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, ক্ষতিকর ভোগ নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কর আরোপ সরকারি অর্থসংস্থানের অনন্য উৎস। ল্যাটিন শব্দ 'ট্যাক্সার' ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইংরেজী 'ট্যাক্স' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ মূল্য আদায় করা। অভিধানে 'কর' শব্দের অর্থ হল রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত আর্থিক অবদান। 'কর' কোন অর্থদন্ড নয়, তবে এ হলো পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি খাত থেকে সরকারি খাতে সম্পদের বাধ্যতামূলক ও প্রতিদানহীন স্থানান্তর।[৪]

* কর বলতে এমন অর্থ বা মূল্যবান সম্পদকে বুঝায় যা সরকার বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা হতে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে।[৫]
* কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'কর' বলতে বুঝানো হয়েছে,

  1.Periodical tax over and above the king's customary grain-share, or general property tax levied periodically.

  2.Emergency tax levied upon the villagers over and above the normal grain share...[৬]
* ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'কর' এর সংজ্ঞায় বলেন–

  "A general property-tax levied periodically."[৭]

* ড. নরেন্দ্রনাথ থের বলেন, "a periodical cess levied in the country parts over and above the state's share of grain".[৮]

আল-কুরআনে ভূমি কর

ভূমি কর সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক এবং জেন রাখ যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৯]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত ও তাফসিরকারদের ব্যাখ্যায় বলা যায়, মহানবী স.-এর সময়ে দান করার এক পর্যায়ে লোকেরা তাদের খারাপ ফল ও নিকৃষ্টতম জিনিস দান সদকা রূপে দিত। এর প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আলী, হাসান রা. ও মুজাহিদ রহ. এ মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি একটি খারাপ বা একটি নিকৃষ্ট খেজুর গুচ্ছ নিয়ে এসে সদকার মালের মধ্যে রেখেছিল। তখন মহানবী স. তা দেখে বললেন, "এই লোকটি যা করল, তা খুবই খারাপ কাজ।" অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হয়।[১০]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. এ আয়াতের প্রেক্ষিত ও পূর্বাপর সম্পর্ক প্রসঙ্গে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ এ তত্ত্বটি উদ্ঘাটিত করেছে যে, যে জিনিস সদকা হিসাবে দেয়া হবে তা অবশ্যই উত্তম ও উৎকৃষ্টতর মাল হওয়া আবশ্যক। আর এ আয়াতে সাধারণভাবে ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ যে সকল হালাল, উত্তম ও উৎকৃষ্ট মাল উপার্জন করে, আর মহান আল্লাহ ভূমি থেকে যেসব ফল বা ফসল দান করেন, ভূমি যে সকল খনিজ দ্রব্য যেমন পেট্রোল, কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি উৎপাদন করে, সে সকল মাল সম্পর্কেই এ নির্দেশ। ফলে মহানবী স.-এর সময়ে যেসব মাল প্রচলিত ও পরিচিত ছিল আর যা পরবর্তীকালে প্রচলিত ও পরিচিত হয়েছে, তা যে কোন সময়ে হোক না কেন, তার সব এ সকল দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হবে।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. এ আয়াতের প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী রহ.-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, আনসারগণ যখন খেজুর ফসল তোলার মৌসুমে সে কাজে মগ্ন হয়ে যেতেন, তখন তারা তাঁদের বাগান থেকে অপরিপক্ক খেজুরের ছড়া এনে মসজিদে নব্বীতে ঝুলিয়ে রাখতেন। দরিদ্র মুহাজিরগণ তা থেকে খেজুর খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। এ সময় কোন কোন লোক নিকৃষ্ট ধরণের খেজুর ছড়া এনে সেই খেজুরের সঙ্গে

ঝুলিয়ে দিত। সে মনে করত এটা কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ নয়। মহান আল্লাহ এ প্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি নাযিল করেছেন।[১১]

আল্লামা মাহমুদ আলুসী রহ. এ আয়াতে– وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ 'আর আমি যা ভূমি হতে' –এই বাক্যাংশ দ্বারা ভূমির ফসলের যাকাত 'উশর' বা অর্ধ 'উশর' স্পষ্টভাবে ফরয প্রমাণিত করছে বলে মনে করেন।[১২]

আল্লামা মাহমুদ আলুসী রহ. লিখেছেন, জমির ফসল কম হোক কি বেশী হোক সবের উপর যাকাত ('উশর) ফরজ হওয়ার কথা এ আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হয়। আয়াতটি এ কথারও দলীল যে, কেউ যদি জমি ভাড়া নিয়ে চাষাবাদ করে ও ফসল ফলায় তাহলে 'উশর দেয়া কর্তব্য হবে সেই জমি চাষাবাদকারীর, জমির মালিকের নয়-যার নিকট থেকে তা ভাড়া স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু জমির মালিক ভাড়া বাবদ যে আয় পেল সে আয় যাকাতযোগ্য হলে তার থেকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।[১৩]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে (২ ঃ ২৬৭ নং আয়াত) 'ইনফাক'-এর নির্দেশ মূলত যাকাত ও 'উশর আদায়ের নির্দেশ। যদিও স্পষ্টভাবে যাকাত ও 'উশর বলা হয়নি। আয়াতে 'ইনফাক' করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দু'পর্যায়ের মাল থেকে। প্রথমত 'যা কিছু তোমরা উপার্জন কর' এ উপার্জন বলতে চাকরী-বাকরী বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে যে নগদ সম্পদ অর্জন করা যায় তাই। আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ জমি থেকে তোমাদের জন্য যা দান (উৎপাদন) করেছেন এই যমীনের ফসলের 'উশর দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রম ও জমিতে চাষাবাদ যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জমি থেকে উৎপাদনেও চাষীকে শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের পর ফসল দেন মূলত মহান আল্লাহ। ব্যক্তি শ্রম বিনিয়োগ করে নগদ বা ভূমির ফসল যা কিছুই পায় তা থেকে অবশ্যই 'ইনফাক' করতে হবে। এই ইনফাক বলতে যাকাত, 'উশর বা অর্ধ-'উশর দেয়া বুঝায়। সেই সাথে সাধারণ দানও বুঝায়। ইসলামী অর্থনীতিতে ফসলের 'উশর বা অর্ধ-'উশর যাকাতের মধ্যেই গণ্য। যাকাত দেওয়ার আদেশ ফরয হয় হিজরতের পরই অবতীর্ণ 'সূরা আল-হাজ্জ' এর ৭৮ নং আয়াতে। কিন্তু জমির ফসল থেকে ইনফাক করার, অন্য কথায় 'উশর দেয়ার আদেশ 'সূরা আল-বাকারা'-এর আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম দেয়া হয়েছে।[১৪] আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. লিখেছেন, "জমির ফসল থেকে 'উশর দেয়ার স্পষ্ট আদেশ এ আয়াতে রয়েছে।"[১৫]

ভূমি রাজস্ব আদায় করার আদেশ নিম্ন লিখিত আয়াতে আরও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য,যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন–এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[১৬]

মুফাস্‌সিরীনের অভিমত

আল্লামা ইব্‌ন কাসির রহ. উল্লেখ করেছেন যে, "মানুষকে উৎপন্ন খাদ্যের সব রকম ফসল ও ফল থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় করে সমাজ গঠনের দিকে মানসিক প্রনোদনা দানের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে। তার কারণ হিসেবে ধরা যায় ঃ

১. তখনো 'যাকাত' মক্কী মানুষের সমাজে ফরজ বলে প্রতিপালিত হওয়ার পরিবেশ তৈরী হয়নি। (দ্বিতীয় হিজরী সালে 'যাকাত'-এর বিধান প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়)

২. ফসল কাটার সময় দরিদ্র আরবরা হাজির হলেও মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে উক্ত ফসল বা ফল থেকে কিছুই দান করতো না। কিন্তু দরিদ্রকে দান করার ব্যাপারেও উৎপন্ন ফসল বা জীবিকার সব কিছু দান করে নিজেকে নিংস্ব করা ও নিরন্ন ভিখারীতে পরিণত করাও দানের উদ্দেশ্য নয় বা ইসলামী সমাজ গঠনেরও নীতি নয়। সে দিকে দৃষ্টি না দিলে সীমা লংঘন করা হবে।[১৭]

আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ বলেছেন, "মানুষকে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত খাদ্যের ফসল ও ফল থেকে আর হালাল পশুর মাংস থেকে আহার করতে হবে, আল্লাহ্‌র হকও আদায় করতে হবে এমনভাবে যাতে অপচয় করা না হয় এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা না হয়। 'ইসরাফ' বা অপচয় সম্পর্কেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ আয়াতে।"[১৮]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যণীয় যে, প্রধানত কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে সুষ্ঠুনীতি কি হতে পারে সে দিকেই মানুষের চিন্তা ও বিবেচনাকে পরিচালিত করার নির্দেশ এ আয়াতটির অন্ত নিহিত তাৎপর্য। অর্থনৈতিক অগ্রগতির উর্ধগতি কৃষির ভিত্তিকে উন্নত করেই শুরু হয়। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে ফসল বা পণ্যে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ তাদেরও জীবন ধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উৎপাদন ব্যবস্থা, বন্টন ব্যবস্থা, যাকাত আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবস্থার পরিচালনাতেই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কার্যকর হবে মহান আল্লাহ্‌র হককে স্বীকৃতিদান করার ফলশ্রুতিতে।[১৯]

উশর দেয়া ফরজ এতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনুল কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী স.-এর কথা ও কাজে 'উশর আদায় করা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া জমির সেচ ব্যবস্থার পার্থক্যের দরুন 'উশর বা অর্ধ 'উশর ফরজ হবার ব্যাপারে সমস্ত ফিকহবিদই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আল হাদীসে কর প্রসঙ্গ

কুরআনুল কারীমের ন্যায় হাদীস শরীফেও 'উশর ফরয হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী স. ফসল ও ফলের যাকাত অর্থাৎ 'উশর দু'ভাগে নির্ধারণ করেছেন। যে সব ভূমিতে বৃষ্টির পানিতে শস্য উৎপাদিত হয়, তার জন্য 'উশর অর্থাৎ এক-দশমাংশ, সেচের পানিতে উৎপাদিত জমির ফসলের 'উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন, "যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।[২০] হযরত 'আমর ইব্‌ন দীনার রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন, যে ফসলকে আকাশের পানি সিক্ত করে, তাতে 'উশর আর যাকে বালতি বা রশি ইত্যাদির সাহায্যে সিক্ত করা হয় তাতে 'উশরের অর্ধেক।[২১]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন ঃ মহানবী স. বলেছেন, (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওসাক-এর কমে কোন যাকাত নেই।[২২]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফি'ঈ রহ., ইমাম আহমদ রহ. এবং বিপুল সংখ্যক ইসলামী আইনবিদগণের মতে প্রত্যেক জমির ফসলের 'উশর দান করা ফরয। তাদের মতে কোন মুসলিমের মালিকানাধীন জমির খাজনা দেয়ার কারণে 'উশরের হুকুম বাতিল হয়ে যায় না, বরং যথারীতি বহাল থাকে।[২৩]

জাহেলি যুগে ভূমি কর আদায়ের বিশেষ পন্থা সমূহ

ইসলাম-পূর্ব আরবের মুশরিকদের শস্যক্ষেত এবং গৃহপালিত পশুর উৎপাদনের উপর কর দানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা এই সব উৎপাদনের এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিত-যা ফকির- মিছকিনদের মঙ্গলার্থে ব্যয় করা হত। তারা অপর একটি অংশ মূর্তিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করে দিত-যা বুতখানার মুতাওয়াল্লীদের জন্য খরচ করা হত। তারা মূর্তিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট অংশটি অত্যন্ত যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করলেও আল্লাহর নির্দিষ্ট অংশটির দিকে কোনই মনোযোগ দিত না। ফলে এই অংশটির বেশীর ভাগই বুতখানার মুতাওয়াল্লীরা হজম করে নিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَاءِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَاكَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

"এবং আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এটা আল্লাহর জন্য এবং

এটা আমাদের দেবতার জন্য।' যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছায় না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।"[২৪]

জাহেলী যুগে বিনিময়ের ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য অন্যের জমি নেয়ার নিয়মও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

তায়েফে ভূমিকর আদায়ের পন্থা

তায়েফ মক্কা নগরী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ট থেকে এর উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ হাজার ফুট। তায়েফের জমি সাধারণত উর্বরা এবং সুফলা। তৎকালীন তায়েফে বনু সাকীফ এবং বনু আমীর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। বনু আমীর সম্প্রদায় সেখানকার সমস্ত জমির মালিক ছিল এবং বনু সাকীফ সম্প্রদায় আধির ভিত্তিতে (অর্ধেক উৎপন্ন মালিকের এবং অর্ধেক কৃষকের) সে সমস্ত জমি চাষাবাদ করত। কাল ক্রমে বনু সাকীফ সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে উঠলে তারা বনূ আমীর সম্প্রদায়কে জমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করে নিজেরাই জমিদার বনে বসে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় তায়েফের সমস্ত ভূসম্পত্তি বনূ সাকীফ সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ছিল।[২৫]

মদীনায় ভূমিকর আদায়ের পন্থা

মহানবী স. মদীনায় হিজরত করে এসে মুসলমান, মূর্তিপূজারী, মুশরিক এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকদের পান। তৎকালীন মদীনা ছিল মূলত কিষাণদের শহর। মদীনায় হিজরত করে এসে মুহাজিরগণ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন এবং আনসারগণ তাদের ক্ষেত কৃষি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, "আমার মুহাজির ভায়েরা হাট বাজারে বেচা কেনায় এবং আমার আনসার ভায়েরা তাদের চাষাবাদ এবং বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।[২৬]

ইসলামের আবির্ভাবের সময় মদীনায় কর আদায়ের তিন-চারটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যথা ঃ

১. কিষাণ জমিদারের কাছ থেকে কিছু জমি নিত এবং সেগুলোর কর হিসেবে জমিদারের কিছু জমি আবাদ করে দিত। ঐ জমিতে যা ফলত, জমিদারই তার অধিকারী হত। হযরত রাফে ইব্ন খাদীজ রা. বলেন, "মদীনায় আমাদের অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী কৃষিক্ষেত ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জমি বর্গা দিত এবং বলত ঃ এই জমিখন্ড আমার এবং ওটা তোমার। অতঃপর কখনো এই টুকরার মধ্যে ফসল ফলত এবং কখনো ঐ টুকরার মধ্যে। অতএব মহনবী স. এটাকে নিষিদ্ধ করে দেন।[২৭]

২.কখনো শুষ্ক জমি খন্ড কিষাণের জন্য নির্দিষ্ট হত আর উর্বর খন্ড জমিদারের ভাগে পড়ত। হযরত রাফে ইব্ন খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা মহানবী স. এর যুগে নদীতট এবং নালার পার্শ্ববর্তী জমির উৎপাদনের বিনিময়ে এবং কখনো উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি বর্গায় খাটাত। কোন কোন সময় একটি নষ্ট হত এবং অন্যটি বেচে যেত। ফলে কোন কোন ব্যক্তি কোন করই পেত না শুধুমাত্র ঐ ফসল

ছাড়া যা ক্ষতি থেকে রক্ষা পেত। এ কারণেই মহানবী স. এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু যদি কোন নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে বর্গা দেয়া হয় তাতে বাঁধা নেই।[২৮]

৩. উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমিদার নিয়ে নিত এবং বাকী অংশ কিষাণ পেত। হযরত জাবির রা. বলেন, "লোকেরা উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ও অর্ধাংশের উপর কৃষিকাজ করত।[২৯]
কিষাণ বর্গা হিসেবে কখনো উৎপাদনের কিছু অংশ দিয়ে দিত, আবার কখনো জমির বদলে অন্য কোন প্রকারের ফসল, যেমন খেজুর ইত্যাদি নিজের ঘর থেকেই দিয়ে দিত। হযরত রাফে বিন খাদীজ রা. তাঁর চাচা হযরত যুহায়ের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন "আমাকে মহানবী স. ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তোমার কৃষিক্ষেতগুলো কি কর? আমি বললাম, আমরা সেগুলো কখনো উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ, আবার কখনো খেজুরের কয়েকটি ওসকের পরিবর্তে বর্গা দেই। তিনি বললেন, এরূপ করো না।[৩০]

মহানবী স. কর্তৃক ভূমিকরের হার নির্ধারণ

মহানবী স. নিজেই ভূমিকরের হার নির্ধারণ করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্দাররা যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি (মহানবী সা.) ভূমিকর আদায় সম্পর্কে নির্দেশনামা লিখে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কাউকে কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা করে পাঠাবার সময়ও তিনি এ সম্পর্কে নির্দেশনামা লিখে দিতেন। তিনি আমর বিন হাযমকে এ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
"এই নির্দেশনামাটি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে আমর বিন হাযমকে ইয়ামেনে পাঠাবার সময় লেখা হচ্ছে, মুসলমানদের জমি থেকে যেন এক দশমাংশ ভূমিকর আদায় করা হয়। ভূমিকরের এই পরিমান সেই সমস্ত জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেগুলোকে বৃষ্টি অথবা জলাশয় থেকে বিনাশ্রম পানি সিক্ত করা হয়। আর যে জমি বালতি দ্বারা পানি সিক্ত করা হয় সে জমির খাজনা এর অর্ধেক অর্থাৎ ২০/১ অংশ হবে।[৩১]
মহানবী স. হামীরের বাদশাহের নামে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তা হলো ঃ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত থাক, নামায পড়, যাকাত দাও, মালে গনীমত থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এক পঞ্চমাংশ আদায় কর। এ ছাড়াও জমির খাজনা আদায় কর। যে জমি জলাশয় অথবা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হবে তার ১০/১ অংশ এবং যে জমি বালতির পানিতে সিক্ত হবে সে জমির ২০/১ অংশ খাজনা হিসেবে ধার্য হবে।[৩২]

খলীফাদের আমলে খাজনার হার

হযরত আবূ যায়দ আনসারী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আলী রা. ফোরাত বিধৌত এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলো গ্রামের কথা উল্লেখ করে আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ

ঘন গম ক্ষেতের উপর প্রতি জারীবে দেড় দিরহাম এবং এক সা ফসল।
মাঝামাঝি ধরনের ক্ষেতের উপর প্রতি জারিবে এক দিরহাম।
খেজুর বাগান ও অন্যান্য গাছ-পালার উপর প্রতি জারীবে ১০ দিরহাম; এবং
আঙ্গুরের চারা লাগাবার পর যখন তিন বছর অতিবাহিত হয় এবং ফল ধরে তখন এর উপর প্রতি জারীবে ১০ দিরহাম ভূমিকর নির্ধারণ করবে।[৩৩]
হুসাইন ইব্‌ন সালেহ হাসানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভূমিকরের এই হার বিভিন্ন রকমের কেন? তিনি বলেছেন, এগুলো বিভিন্ন সময়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল; তাছাড়া এই হার নির্ধারণ করার সময় খামার (ফার্ম), বাজার এবং পানিঘাটের নৈকট্য ও দুরত্বের কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল।[৩৪]

ভূমিকরের হার নির্ধারণ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ভূমিকর নির্ধারণ করতে হবে। কেননা কুর'আনে বলা হয়েছে,"আর সেগুলো কাটার সময় তার 'হক' দিয়ে দিবে" - এই নির্দেশের সাথে সতর্ক করে বলা হয়েছে "বরং সীমালংঘণ করো না"। মুফাসসিরগণ এর ব্যখ্যায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হল, রাষ্ট্র যেন অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সাথে কর ধার্য করে এবং এতে যেন অন্যায় অবিচারের বশবর্তী না হয়। ভূমিকর যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে কিনা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। হযরত ওমর রা.-এর শাসনামলে প্রতি বছর ইরাক থেকে খাজনাস্বরূপ যে দশ কোটি আওকিয়ার মত আসত তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য প্রতি বছর দশজন কুফি এবং দশজন বসরীকে ডেকে পাঠাতেন। তারা আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে সাক্ষ্য দিত যে, এই খাজনা কোন যিম্মী বা মুসলমানদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করা হয়নি। উপরন্তু এটা হালাল এবং পবিত্র।[৩৫]
হযরত 'উমর রা. হযরত আ'মর ইব্‌ন 'আস রা.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি ভূমিকর নির্ধারণের ব্যাপারে মকুকিসের (রোমান সম্রাটের অধিনস্ত মিসরের শাসনকর্তা) পরামর্শ নেন। ভূমি করের ব্যাপারে অভিজ্ঞ একজন কিবতীকেও মদীনায় ডেকে পাঠিয়ে তার জবানবন্দী গ্রহণ করেন।[৩৬]
মিসরের প্রতি জারীব জমির উপর এক দিনার ও তিন আরদব খাজনা এবং প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্কের উপর দু'দিনার ধার্য করে হযরত আ'মর ইব্‌ন 'আস রা. হযরত 'উমর রা.-কে তা জানান এবং হযরত 'উমর রা. সেটাকে অনুমোদন করেন।[৩৭]

কর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম যাকাত কুর'আন ও হাদীস দ্বারা ফরয হিসেবে প্রমাণিত। ইসলামের দৃষ্টিতে ফরজ অস্বীকারকারী কাফির বা মুরতাদ। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকদের কাজ বলেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ -

বল, 'আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ। অতএব তোমরা তারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।"[৩৮] হযরত আবূ বকর রা. খলীফার আসনে সমাসীন হবার পর একদল বিদ্রোহী যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যখন ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর শপথ! যারা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দিত, তারা যদি আজ উটের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।[৩৯] তখন হযরত 'উমর ফারুক রা.-সহ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যারা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী, নামাজও আদায় করে, শুধুমাত্র যাকাত অস্বীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হবে কেন? হযরত আবূ বকর রা.-এর যুক্তি ও দৃঢ়তার সাথে একমত পোষণ করে সাহাবীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।[৪০] অতএব ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করার পরও যদি কেউ শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করে যাকাত আদায় না করে তা হলে সে মূলত ইসলামকেই অস্বীকার করল।

প্রশ্ন হতে পারে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে কর বা খাজনা দেয়ার পরও যাকাত দিতে হবে কেন? কর বা খাজনা আদায় করলেও যাকাত দিতে হবে। যাকাত ও কর এক সাথে হতে পারে না-এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, যাকাত কর নয়, মূলত এটা একটি অর্থনৈতিক ইবাদত। কর বা ট্যাক্স প্রদান কোন ইবাদত নয়।[৪১] কর ও ইবাদতের মধ্যে মৌলিক ধারণা ও নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঃ

১.**নাম ও শিরোনাম ঃ** কর ও যাকাতের মধ্যে প্রথম পার্থক্য এদের নামের অর্থের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যাকাত শব্দটি আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রবণ বুঝায়। পক্ষান্তরে কর বলতে সাধারণত জরিমানা, খারাজ (ভূমি কর) অথবা জিজিয়া (বাধ্যতামূলক চাঁদা) ইত্যাদি বুঝায়।

২.**মৌলতত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ঃ** যাকাত এমন একটি ইবাদত যা মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায়ের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কর এরূপ নয়। তা নিছক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা, ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোন ভাবধারাই তাতে নেই।[৪২] এ জন্য যাকাত আদায় ও আল্লাহর দরবারে কবুল হবার জন্য নিয়ত শর্ত। কেননা নিয়ত ছাড়া কোন ইবাদত কবুল হয় না। আমলসমূহের মূল্যায়ন নিয়তের উপরই হয়।[৪৩] এ কারণেই ইসলামী শরী'অত অমুসলিমদের উপর যাকাতের ভার চাপায়নি। কিন্তু কর সেরূপ নয়। তা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের উপর ধার্য করা হয়।

৩. **নিসাব নির্ধারণ ঃ** যাকাতের নিসাব পূর্ব নির্ধারিত। নির্ধারিত পরিমাণ হতে এক বিন্দু পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। 'কর' এরূপ নয়। তার ক্ষেত্র, তার পরিমাণ, তার মূল্যায়ন ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি সব কাজই রাষ্ট্র-সরকারের চিন্তাভাবনা ও প্রশাসকদের পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।[৪৪]

৪. স্থিতি ও স্থায়িত্ব ঃ এ পৃথিবীর বুকে যতদিন ইসলাম ও মুসলমান থাকবে, যাকাত ব্যবস্থাও ততদিন কার্যকর থাকবে। কোন অত্যাচারী প্রশাসকও তা নাকচ করতে পারে না, সুবিচারের নাম করেও তাতে কেউ কোন পরিবর্তন আনার অধিকারী নয়। কিন্তু 'কর' ব্যবস্থায় এরূপ স্থিতিশীলতা ও চিরন্তনতার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ধার্য হয়, প্রয়োজন শেষ হলে তাও শেষ হয়ে যায়।[৪৫]

ব্যয়ের ক্ষেত্র ঃ যাকাতের ব্যয়ের ক্ষেত্র বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর কিতাবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মহানবী স. বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। এর ব্যয় খাতসমূহ যেমন মানবিক তেমনি ইসলামসম্মতও। কিন্তু 'কর' রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজনসমূহ পূরণার্থে ব্যয় করা হয়ে থাকে এবং সে খাত সমূহ সরকারই নির্ধারণ করে থাকে।[৪৬]

রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ঃ 'কর' আদায়ের ব্যাপারটি সম্পদ, মালিক ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। প্রশাসন কর্তৃপক্ষই তা আরোপ করে এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করে। প্রশাসন ইচ্ছে করলে তা কমাতে, বাড়াতে কিংবা প্রয়োজনে ক্ষমা করতে পারে। পক্ষান্তরে যাকাতের অবস্থা ভিন্নতর। যাকাত মহান আল্লাহ কর্তৃক ফরয হেতু তা নির্ধারিত খাতেই ব্যয় করতে হয়। এ অবস্থা হতে কোনভাবেই নিস্কৃতি পাওয়া যায় না। যাকাত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে প্রদান করা হয় বলে কেউ এতে ফাঁকি দিতে চায় না, কিন্তু সাধারণ মানুষ সুযোগ পেলেই 'কর' ফাঁকি দিতে চায়।[৪৭]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ যাকাতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কর ব্যবস্থা সে পর্যন্ত পৌঁছার কথা চিন্তাও করতে পারে না। যাকাতের অর্থ সর্বক্ষেত্রে ব্যয় করা যায় না। কিন্তু করের অর্থ যে কোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে। করের অর্থ দ্বারা দেশের সকল নাগরিকই সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যাকাতের অর্থ দ্বারা শুধুমাত্র যাকাত প্রাপ্যরাই সুবিধা ভোগ করতে পারবে।[৪৮]

ধার্যকরণ (ক) ঃ যাকাত শুধুমাত্র বিত্তশালী মুসলিমদের জন্যই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর বিশেষতঃ পরোক্ষ কর সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণকে দিতে হয়।[৪৯]

ধার্যকরণ (খ) ঃ যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের উপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না বরং সম্পদ ঘরে জমা থাকলেই যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর। আয় বাড়লে করের পরিমাণ বাড়ে।[৫০]

ধার্যকরণ (গ) ঃ উৎপাদনশীল জমির (স্থাবর সম্পত্তি) কর বাধ্যতামূলক, দিতেই হবে। (ফসল হোক বা না হোক) পক্ষান্তরে ফসল উৎপাদিত হলেই শুধু যাকাত দিতে হবে; অন্যথায় নয়। মূলত ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। কর জমির উপর ধার্য করা হয়। আর ফসলের উপর 'উশর ধার্য হয়।[৫১]

ধার্যকরণ (ঘ) ঃ সরকার সাধারণত মূলধন, আয়, আমদানী, ব্যক্তির ভোগ্য ও ব্যবহার্য জিনিসের উপরও কর ধার্য করে। কিন্তু ভোগ্য ব্যবহার্য জিনিসের উপর ইসলাম যাকাত ধার্য করে না। কারণ যাকাত ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে গরীব, মিছকিন এবং দীন ও

জাতির সাধারণ কল্যাণের নিমিত্তে ব্যয় করা হয়। আর ভোগ ব্যবহারকারী যেমন গরীব লোক হয় তেমনি ধনী লোককেরাও। তাই ভোগ্য ব্যবহার্য জিনিসের উপর ইসলাম যাকাত ধার্য করেনি।[৫২]

১২. যাকাত ফরয ইবাদত ঃ প্রশাসন যাকাত আদায় না করলেও তা ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে আদায় করতে হবে। যাকাত ফরয হবার কথা অস্বীকার করলে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। ক্রমাগত কয়েক বছর না দিলেও তা ফরয হিসেবে থেকে যায়। 'কর' এরূপ নয়। কর সরকার চাইলে দিতে হয়, আর না চাইলে তা নাকচ হয়ে যায়।[৫৩]

পরিবর্তন ঃ যাকাতের মধ্যে করের সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাকাতের হার অপরিবর্তনীয়। ১৪শত বছর পূর্বে মহানবী স. যে হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত কোন স্বেচ্ছাচারী সরকারও পরিবর্তন করতে সাহস পায়নি। পক্ষান্তরে করের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের হাতে কুক্ষিগত। প্রায়শই এ ক্ষমতা সরকারকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলে এবং জনগনের উপর অর্থনৈতিক অন্যায় অত্যাচার চালাতে সহায়তা করে।[৫৪]

তথ্যপঞ্জি

১. 'বালি' প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার রাজস্ব সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত শব্দ। রাজ্যের অন্তর্গত প্রজা ও বিজিত রাজাদের কাছ থেকে রাজার প্রাপ্যকে বালি বলে। (Dr. Upendra Nath Ghoshal, *Contribution to the History of the Hindu Revenue System,* Calcutta : Saraswat Library, 1972, p. 45)

২. 'কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র'–সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কূটনীতিবিশারদ মন্ত্রী এবং অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্যের অপর নাম। (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* ঢাকা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫, পৃ.১৬৯)।

৩. এম হবিবুল্লাহ এবং স্বপন কুমার বালা, "কর", *বাংলা পিডিয়া,* ২য় খ., ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১৫৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ১ম খ., ৩য় ভাগ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ৫১১।

৬. Dr.Upendra Nath Ghoshal, *Contribution to the History of the Hindu Revenue System,* Saraswat Library, Calcutta, 1972. P. 404

৭. Dr. Romesh Chandra Majumdar, *History of Bengal,* Vol.1., Dacca University, 1963, P. 277.

৮. Dr. Narendranath Kher, The Agrarian and Fiscal Economy in the Mauryan and Post-Mauryan

Age (Cir.324ABC to 320 AD) Motilal Banarsidass, 1973. P.300

৯. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭।

১০. ফখরুদ্দীন রাযী , *তাফসিরুল কাবীর*, তেহরান : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ৭ম খ., পৃ.৬১।

১১. সাইয়্যেদ কুতুব, ফী-যিলালিল কুরআন, ৩য় খ., বৈরুত : দারুশ-শুরুক, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ.৫৯-৬০।

১২. আবুল ফজল শিহাব উদ্দীন সাইয়্যেদ মাহমুদ আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ৩য় খ., বৈরুত : দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৪০৫/১৯৮৫, পৃ.৩৯-৪০।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ১ম খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ.২১৪- ১৫।

১৫. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০।

১৬. আল-কুরআন, ৬:১৪১।

১৭. ইব্‌ন কাসির, তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর, বৈরুত : দারুল কলম, তা.বি., পৃ.২৩-২৪।

১৮. সাইয়্যেদ কুতুব, ফী-যিলালিল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০।

১৯. অধ্যাপক রায়হান শরীফ, *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ২য় খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০,পৃ.৫৮।

২০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.২০১।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.২০১।

২৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, *উশর*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।

২৪. আল কুরআন, ৬:১৩৬।

২৫. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, (অনূ :মুহাম্মদ আবদুল মতীন জালালাবাদী), *ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ১ম খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বংলাদেশ, ২০০৩, পৃ.২২৯।

২৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*,

২৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, পৃ.৩১৪।

২৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খ., দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যা, তা.বি, ম

২৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*,

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. ইমাম আবূ আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবের বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ.৭০।

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

৩৪. প্রাগুক্ত,

৩৫. আবূ ইউসূফ ঃ কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

৩৬. মাকরিযী, কিতাবুল খাত্তাত ঃ পৃষ্ঠা ১১৯-২০; ইবন আবদিল হাকিম, ফুতুহে মিসর, পৃ.১৬১

৩৭. ফুতুহুল বুলদান

৩৮. আল কুরআন,৪১:৬-৭

৩৯. মেশকাত শরীফ

৪০. লেখকমন্ডলী, ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, ঢকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ.১৭৪

৪১. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, দারিদ্য বিমোচনে যাকাতঃপ্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সেমিনার, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,৩ জুন,১৯৯৮, পৃ.১৯

৪২. কোন কোন অর্থনীতিবিদ যাকাতকে সম্পদের কর হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যা মোটেই ঠিক নয়। যাকাত কোন ভাবেই কর নয়। (Choudhury Masudul Alam, The Roll of Zakat, The Islamic Quasi wealth Tax in Resource Allocation, Contribution to Islamic Economi Theory, London, Macmillan-1986

৪৩. বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস 'প্রত্যেক কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'

৪৪. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১, পৃ.৫২২-২৩

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৩

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৩-২৪

৪৮. লেখকমন্ডলী, ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬।

৫২. এ,জি এম বদরুদ্দুজা, যাকাতের ব্যবহারিক বিধান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ.১৭

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

৫৪. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন,প্রাগুক্ত, পৃ.২১

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯৬

আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা (ইসলামী ফিকাহ বিশ্বকোষ)-এর ভূমিকা

॥ তৃতীয় কিস্তি ॥

মাযহাবের স্থিতি ও তার ক্রমবিকাশ : بقاء المذاهب وانتشاره

আমরা যতদূর জেনেছি কিছু মাযহাব উৎপত্তির পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অন্যগুলো টিকে আছে এবং বিকশিত হয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বিষয়টি শাসনক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে সম্পর্কিত।

মূলত এমত বাস্তবসম্মত নয়। প্রচলিত মাযহাবসমূহের অস্তিত্ব বজায় থাকা ও তার ক্রমবিকাশে শাসক গোষ্ঠী ও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভূমিকা থাকলেও তা ছিল নগণ্য যেমন আব্বাসী খিলাফতকালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল এবং বিচার বিভাগ ছিল হানাফী ফকীহদের প্রভাবাধীন। এতদসত্ত্বেও আমরা উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে হানাফী মাযহাবের অতি অল্প সংখ্যক অনুসারী জনগোষ্ঠী দেখতে পাই। বরং তৎকালে পারস্যের অধিকাংশ এলাকার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীরা। আর হানাফী মাযহাব এ অঞ্চলের ইরাক, ট্রান্স-অক্সানিয়া (মধ্য এশিয়া) ও পারস্যের কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। এক সময় মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় উসমানী খেলাফত বিস্তৃত ছিল এবং তাদের সরকারী মাযহাব ছিল হানাফী মাযহাব। সমগ্র উসমানী সাম্রাজ্যে বিচার ব্যবস্থা ছিল এই মাযহাবের আলেমদের প্রভাবাধীন। এসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, তিউনিসিয়ার রাজধানীর তুর্কী বংশোদ্ভূত কিছু পরিবার ব্যতীত সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মালিকী মাযহাবই প্রসার লাভ করেছে। মিসরেরও একই অবস্থা। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। তন্মধ্যে মিসরের পোর্ট সাঈদ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মালিকী মাযহাবের কিছু সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। আর অল্প সংখ্যক ক্রম-অবলুপ্ত তুর্কী বংশোদ্ভূত শারকাসী[১] অথবা বিচার বিভাগে চাকুরি পাওয়ার আশায় এই মাযহাব গ্রহণকারী ব্যতীত হানাফী মাযহাবের অনুসারী খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মজলিসগুলো এই মাযহাবের ছাত্রদের দ্বারা সমৃদ্ধ থাকতো, তথাপি সাধারণ মানুষ ছিল শাফিয়ী কিংবা মালিকী মাযহাবের অনুসারী। অতএব কোনো বিশেষ মাযহাবের অস্তিত্ব বজায় থাকার ও তার ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা কোথায়? একই কথা বলা যায় আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলগুলোর বেলায়ও। এসব এলাকা সম্পূর্ণরূপে উসমানী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তাসত্ত্বেও আমরা দেখি, সেখানে মালিকী, হাম্বলী এবং কখনো অল্প পরিসরে শাফিঈ মাযহাব প্রসার লাভ করেছে এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বস্তুত যেকোন মাযহাবের স্থিতি বা তার প্রসার সর্বপ্রথম যার উপর নির্ভর করে তাহলো মাযহাব প্রণেতার প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এবং মাযহাবের প্রচার

তার মতামতসমূহ বিশ্লেষণ ও সহজ সুন্দরভাবে এসব মতামত ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনে তার সহকর্মীদের শক্তি-সামর্থ্য ও ধারাবাহিকতা।

তাক্লীদ : التقليد।

কারো ধর্মীয় কোনো বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ আলেমের অনুসারণকারীর নিন্দায় কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করেন। তাদের কেউ কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এ ধরনের অনুসারী মুকাল্লিদকে মুশরিকদের সম-পর্যায়ভুক্ত করেছেন ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِ هِمْ مُهْتَدُوْنَ.

আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী হিসেবে এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।"[২]

প্রকৃতপক্ষে আকীদা-বিশ্বাস ও দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ-যা দীনের অতি আবশ্যকীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত–এসব বিষয়ে কোন আলেমের তাকলীদ (নির্বিচার অনুসরণ) করা যাবে না, তিনি যতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেনো। তাই সংক্ষিপ্তভাবে হলেও শরীয়ত প্রণেতার নিকট থেকে এটি প্রমাণিত হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে হবে। আর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে পর্যালোচনার দাবি রাখে। জন সাধারণকে দলীল প্রমাণ পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া হলে তা তাদের জন্য কষ্টকর হবে এবং জীবন অচল হয়ে যাবে। যদি আমরা প্রত্যেক মুসলমানকে মুজতাহিদের ন্যায় প্রতিটি মাসআলার প্রতি মনোযোগ দেয়ার দায়িত্ব দেই তাহলে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে এবং জনকল্যাণ ব্যাহত হবে। এ বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ উম্মতের পূর্বসূরীগণের সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন না, অথচ রসূলুল্লাহ স.-এর ভাষ্য অনুযায়ী তারা ছিলেন সর্বোত্তম যুগের মানুষ। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই মুজতাহিদ ছিলেন। তাদের মধ্যে অধিক ফতোয়াদানকারীর (আইনগত মতামত ব্যক্তকারীর) সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ তেরোজন। তবে যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা আছে তাঁর উচিত ইজতিহাদের উদ্দেশ্য ও শর্তসমূহের পূর্ণ অনুসরণ করে ইজতিহাদ করা।

আশ্চর্যের বিষয়, তাকলীদের সমালোচনায় যারা বাড়াবাড়ি করেন তাদের কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তির মুজতাহিদ হওয়ার জন্য তার কাছে এক খানা কুরআন, সুনানে আবু দাউদ ও একটি অভিধান গ্রন্থ থাকাই যথেষ্ট। তার নিকট এই সামান্য কয়টি কিতাব থাকলেই সে মুজতাহিদ হতে পারবে এবং মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের কারো অনুসরণ করার প্রয়োজন তার নেই। ইজতিহাদ করার জন্য যদি এককপি কুরআন, সুনানে আবু দাউদ ও একটি অভিধান গ্রন্থই যথেষ্ট হয় তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীদের প্রত্যেকে অবশ্যই একেক জন মুজতাহিদ ছিলেন। কেননা তাঁরা ছিলেন খাঁটি আরব অথবা খাঁটি আরবীয় পরিবেশে তাঁরা বড়ো হয়েছেন। তাঁরা কুরআন নাযিলের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রসূলুল্লাহর স. যুগেরই মানুষ। কিন্তু বাস্তবতা তাদের সেসব দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইমামদের তাকলীদ করাকে শিরক বলা এবং ইমামদের প্রতি দেবত্ব আরোপের অভিযোগ উত্থাপন ভিত্তিহীন। কারণ শিক্ষিত তো দূরের কথা, কোন মূর্খ ব্যক্তিও নেই যিনি ইমামের কোন কিছু হালাল বা হারাম করার অধিকার রয়েছে বলে ধারণা করতে পারেন, যে অধিকার একান্তভাবেই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। বরং তাদের সকলের আকীদা এই যে, ইমাম বা অনুরূপ যিনি তাঁর জ্ঞানের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, দীনের ব্যাপারেও নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত; আরো আশ্চর্যের বিষয়, এ

যুগে যারা নিজেদের ইজতিহাদ করার যোগ্য বলে দাবি করেন এবং ইজতিহাদ করার আহ্বান জানান তাদের অধিকাংশই কুরআন থেকে শরঈ বিধান উদ্ভাবন করা তো দূরের কথা, কুরআনের একটি আয়াতও শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়। অথচ মুজতাহিদ হওয়ার জন্য ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য হলো-আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। নাসিখ-মানসূখ, আম-খাস, মুতলাক, মুকায়্যাদ ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আরো কিছু বিশেষ প্রস্তুতি থাকতে হবে যা কেবল অতি অল্প সংখ্যক নিবেদিত ব্যক্তির পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যেক মুসলমানের জ্ঞাত থাকা জরুরী যে, কারো ব্যক্তিগত ইবাদত ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। বরং তার সামনে কোন ঘটনা উপস্থিত হলে অথবা কোন সমস্যার উদ্ভব হলে কর্তব্য হবে, এ সম্পর্কে এমন ব্যক্তির নিকট শরীয়তের বিধান জিজ্ঞেস করা যিনি জ্ঞানে ও দীনদারীতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং যার প্রতি তার আন্তরিক আস্থা রয়েছে। দীনের অপরিহার্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়েই কেবল তা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এমন কোন মত গ্রহণযোগ্য হবে না যা আগের বা পরবর্তী কালের মনীষীদের বক্তব্য হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নয়।

কোন ব্যক্তি সুদ, মদপান, নামায ত্যাগ এবং নামাযের পরিবর্তে কাফ্ফারা প্রদানকে হালাল ফতোয়া দিলে তার এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের ফতোয়াকে পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ওজর হিসাবেও পেশ করা যাবে না।

ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা : إقفال باب الإجتهاد

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিছু আলেম ইজতিহাদের দরজায় তালা লাগানোর দাবি তোলেন। তাঁরা বলেন, আগেকার মুজতাহিদগণ পরবর্তীদের জন্য গবেষণার কোনো কিছু বাকী রেখে যাননি। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল, উচ্চাবিলাষ প্রতিরোধ, দায়িত্বহীনতা রোধ, স্বৈরাচারী শাসকদের নিয়ন্ত্রণ, ভয় কিংবা আগ্রহের বশে অযোগ্য লোকদের ইজতিহাদে হস্তক্ষেপের আশংকা। সুতরাং এ সুযোগের অপব্যবহার রোধ কল্পে তারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করার ফতোয়া দিলেন। তারা তাদের মতামতে প্রকাশ করতে গিয়ে সর্ব সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অসন্তোষের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগে যুগে দেখা গেছে, কেউ ইজতিহাদের দাবি করেছেন অথবা কারো পক্ষে দাবি করা হয়েছে, তাদের অনেক ক্রটিহীন ইজতিহাদ (গবেষণাকর্ম) ছিল। যেমন, ইবনে তাইমিয়া, তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম এবং হানাফী মাযহাবের আল-কামাল ইবনুল হুমাম। নিজ মাযহাবের বাইরেও তাঁর ইজতিহাদ কর্ম রয়েছে। আরো আছেন জামউল জাওয়ামে'-এর গ্রন্থকার তাজুদ্দীন আস-সুবকী ও তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা। যাই হোক, তাদের ইজতিহাদ ছিল একমতের উপর অন্য মতকে অগ্রাধিকার প্রদান অথবা পূর্ববর্তী আলেমগণের যুগে উদ্ভূত হয়নি এমন সমস্যার সমাধান পেশ করা।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত, ইজমার ক্ষেত্রসমূহ, সাহাবায়ে কিরাম তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তীদের ফতোয়ার মূল্যায়ন করার জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলেম থাকা আবশ্যক। তদ্রূপ আরবী ভাষায় তাদের পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে, যে ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে ও নবী করীম স.-এর হাদীস সংকলিত হয়েছে। তবে অগ্র গণ্য শর্ত হলো-তাদেরকে ইসলামের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে

তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। জনগণ যেনো উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান জানতে তাদের নিকট সহজে যেতে পারে। ইজতিহাদের দরজা যোগ্য-অযোগ্য সরার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা এতে অনুপযুক্ত ব্যক্তিও ইজতিহাদ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে, যে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেই সক্ষম নয়। তার পক্ষে সঠিক ভাবে বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহকে সুসামঞ্জস্য করা এবং এক মতকে অন্য মতের উপর অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব নয়।

যারা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা মূলত অযোগ্য লোকদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা দাবি এবং আল্লাহ্‌র উপর তাদের মিথ্যা আরোপকে ভয় করতেন। এরা দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বলে ফেলে, এটি হালাল, এটি হারাম। বস্তুত শাসক গোষ্ঠীকে খুশী করাই এদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। আমরা বহু লোককে দেখেছি যারা ইজতিহাদের দাবি করে এবং নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার মানসে নিছক ধারণার কল্পনার ভিত্তিতে বলে দেয় বিষয়টির আইনগত সমাধান এই এই। আর শাসকরাও এসব খোঁড়া মুজতাহিদের মতামতের উপর নির্ভর করেন। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, অনেকে ফতোয়া দেন, ব্যবসায়িক সুদ (profitter) বৈধ এবং ভোক্তাসুদ বৈধ নয়। আরো অগ্রসর হয়ে কোনো কোনো ব্যক্তি সাধারণভাবে সকল সুদকে (Consumer) বৈধ বলেছে। কেননা তার ধারণামতে এতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা গ্রহণ করা উচিত। আবার কেউ কেউ বংশবিস্তার রোধে শর্তহীনভাবে গর্ভপাতকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছে। কারণ শাসকগোষ্ঠী এরূপ মত পোষণ করেন। এর নাম দেয়া হয়েছে পরিবার ব্যবস্থাপনা। এদের কেউ আবার মত দিয়েছে, কোন ব্যক্তি হদ্দযোগ্য অপরাধে অভ্যস্ত না হলে (অপরাধ ঘটনাক্রমে হলে) তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। শরীয়ত বিরোধী এ জাতীয় আরো অনেক মত বা রায় যা নিষ্ঠাবান আলেমদেরকে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করার পক্ষে কথা বলতে বাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়ার মতটি শরীয়তের মূল উৎস ও প্রাণশক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বস্তুত সঠিক কথা হচ্ছে, ইজতিহাদ করা জায়েয, বরং যার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলী বিদ্যমান তার জন্য ইজতিহাদ করা ওয়াজিব অপরিহার্য। কারণ অতীতকালে ঘটেনি এমন অনেক নিত্য নতুন বিষয়ের শরঈ বিধান জানা মুসলিম উম্মাহর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

ইজতিহাদের উৎস : مصادر الاجتهاد

আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সব বিধি বিধানের উৎস আল্লাহ তাআলা, যা ওহীর মাধ্যমে লাভ করা যায়। আর ওহী হতে পারে মাতলু অর্থাৎ কুরআনুল কারীম অথবা গায়রে মাতলু অর্থাৎ রসূলুল্লার স. সুন্নাহ। রসূলুল্লাহ স. নিজ থেকে কোন কিছু বলতেন না। তিনি তাই বলতেন, যা তাঁর উপর ওহী করা হতো। এভাবে বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, সকল বিধি বিধানের উৎস সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ।
আর ইজমা হলো আল্লাহ্‌র বিধানের উদ্‌ঘাটনকারী। কেননা গোটা উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার উপর একমত হয় না।
আর কিয়াস হলো, মুজতাহিদের ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান উদ্‌ঘাটন। প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই ধারণা যথেষ্ট হবে যতক্ষণ কিয়াসের শর্তসমূহ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য 'সত্য একাধিক হয় না' বা আমাদের বক্তব্য অন্য যাই হোক না কেন উসূল সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ বর্ণিত হবে। তবে এখানে এমন দু'টি বিষয় আলোচনা করছি যা নিয়ে ইদানিং বেশী বিতর্ক হচ্ছে।

(ক) প্রথম বিষয় - সুন্নাহ সংক্রান্ত : حول السنة

কিছু লোক ছড়িয়েছে যে, সুন্নাহ শরীয়তের উৎস নয়। তারা নিজেদের নাম দিয়েছে কুরআনপন্থী এবং বলছে, আমাদের সামনে কুরআন রয়েছে তাই আমরা এর মাধ্যমেই হালাল হারাম নির্ধারণ করবো। তাদের ধারণামতে, সুন্নাহর মধ্যে রসূলুল্লাহ স. এর নামে বিভিন্ন মিথ্যা হাদীস ঢুকানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ স. এদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম মেকদাদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ 'আমি আশংকা করছি অচিরেই কোন ব্যক্তি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে আমার হাদীসের মধ্য হতে একটি হাদীস বর্ণনা করবে। সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে। অতএব সেখানে আমরা যা হালাল পাবো তাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করবো এবং যা হারাম পাবো তাকে হারাম মেনে নেবো।' জেনে রেখো আল্লাহ যা হারাম করেছেন, রসূলুল্লাহ স. তা হারাম করেছেন। এরা কখনই কুরআন পন্থী নয়। কেননা কুরআনুল কারীমের প্রায় ১০০ আয়াতে রসূলুল্লাহর স. আনুগত্যকে ওয়াজিব বলা হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্‌র স. আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

مَنْ يَطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا-

কেউ রসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি।[৩]

বরং যারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরার দাবি করে অথচ রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে এবং তাঁর আদেশ গ্রহণ করে না, কুরআনুল কারীম তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে।

فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।[৪]

তারা আরো বলে, মাওদু' (জাল) ও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস দ্বারা সুন্নাহ কলুষিত হয়ে গেছে। অথচ এই উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ সব ধরনের অনুপ্রবেশ থেকে সুন্নাহকে বিশুদ্ধকরণের জন্য অত্যাধিক যত্ন নিয়েছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন বর্ণনাকারীর সততায় সন্দেহ অথবা তার কোন ভুলের সম্ভাবনাকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলমানদের শত্রুরাও সাক্ষ্য দিবে যে, এই উম্মত বর্ণনাসূত্রের ব্যাপারে যে যত্ন নিয়েছে এবং যেভাবে সংবাদ বিশ্লেষণ করে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত হাদীস যাচাই বাছাই করেছে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। কোন হাদীসের উপর আমল ওয়াজিব হওয়ার জন্য সেটি রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ স. তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে (কমপক্ষে) যে কোন একজনের নিকট তার দাওয়াত পৌঁছে দেয়াকে যথেষ্ট

মনে করতেন। এতে প্রমাণিত হয় খবরে 'ওয়াহিদ'-এর সত্যতার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলে তার উপর আমল করা ওয়াজিব।

এরপর তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন, সেই আয়াতগুলো কোথায় যা নামাজের নিয়ম কানুন, ফরজ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া, যাকাত ইসলামের স্তম্ভ হওয়া, হজ্জের কাজসমূহ এবং অন্যান্য বিধিবিধান প্রমাণ করে, যেগুলো সুন্নাহ ব্যতীত কোন উৎসে থেকে জানা সম্ভব নয়।

আরেকটি দল আছে যারা এই শ্রেণী থেকে কম ক্ষতিকর নয়। তারা বলে, আমরা ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুন্নাহ কে শরীয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু দুনিয়াবী বিধিবিধান অথবা আচার-আচরণে সুন্নাহ আমাদের নিকট দলীল নয়। তারা একটি নগণ্য অস্পষ্টতার কথা বলেন। আর তাহলো খেজুর গাছে পরাগায়ণ সংক্রান্ত ঘটনা। 'রসূলুল্লাহ স. মদীনায় হিজরত করে দেখলেন, সেখানকার লোকজন খেজুর গাছে পরাগায়ণ করছে (অর্থাৎ তারা স্ত্রী খেজুর গাছের রেনু পুরুষ গাছের মুকুলের সাথে কলম করছে)। তিনি তাদের বললেন, যদি তোমরা এটা না করতে তবে ভালো হতো। তারা এরূপ করা ছেড়ে দিল এবং তাতে খেজুরের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এরপর অন্যদিন তিনি তাদেরকে অতিক্রম করার সময় বললেন, তোমাদের খেজুরের কি অবস্থা? তারা বললো, এমন এমন। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, -انتم أعلم بأمر دنياكم

"তোমরা তোমাদের দুনিয়ার বিষয়ে অধিক জানো।[৫] এ হাদীসটি যদি কোন কিছু প্রমাণ করে তবে তা এটুকুই যে, যেসব দুনিয়াবী বিষয়াবলীর সাথে শরীয়তের হালাল, হারাম কিংবা শুদ্ধ, ভুলের কোন সম্পর্ক নেই; বরং তা অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট তা আল্লাহ্র দীনের প্রচারক হিসেবে রসূলুল্লাহ স. দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয়। বরং হাদীসটি প্রমাণ করে এ জাতীয় বিষয়গুলো অভিজ্ঞতার অধীন এবং শরীয়তের সাথে সম্পর্কহীন নিছক দুনিয়াবী বিষয়াবলীর মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম তা জানার লক্ষে চেষ্টা সাধনা করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. ছিলেন একটি বাস্তব আদর্শ। সুতরাং এই ঘটনাটি এবং রসূলুল্লাহ স.-কে এটি হালাল অথবা হারাম অথবা এই কাজটি শাস্তি অপরিহার্য করে অথবা অপরিহার্য করে না অথবা এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ কিংবা শুদ্ধ নয় এরূপ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার মধ্যে কত পার্থক্য বিদ্যমান! কেননা এই কাজগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর দায়িত্বের মূল বিষয়। তার আনুগত্য করাকে আল্লাহ আমাদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, যে সকল বিষয় তিনি তার প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রচার করবেন।

খ. দ্বিতীয় বিষয় : المسألة الثانية

বর্তমান যুগে বিভিন্ন সময় শরীয়তকে জনকল্যাণের উপর নির্ভরের দাবি প্রচার করা হচ্ছে এই যুক্তিতে যে, ইসলামী শরীয়ত মানব কল্যাণের জন্যই এসেছে। সুতরাং যা কল্যাণকর আমরা তা গ্রহণ করবো, যা অকল্যাণকর তা থেকে বিরত থাকবো। কথাটি ভালো, তবে উদ্দেশ্য খারাপ। নিশ্চয়ই সামগ্রিকভাবে ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। কিন্তু এই কল্যাণ কি? এটি কি প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয়দান ও অবাধ্য লোকদের সন্তুষ্টি বিধান? নাকি সেটি প্রকৃত কল্যাণ যার ভিত্তিতে মানুষের কাজ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। অতঃপর কাল্পনিক কল্যাণ ও প্রকৃত কল্যাণের মধ্যে পার্থক্যের পদ্ধতিই বা কি?

আমাদের জানা ও দেখামতে মানুষের স্বভাব বিভিন্ন রকম। কেউ এটা পছন্দ করলো তো অন্য কেউ তা অপছন্দ করে, আবার কেউ কোনকিছু অপছন্দ করলেও অন্যজন তা পছন্দ করে। পছন্দকারী তার পছন্দের বিষয়ে কল্যাণ ও উপকারের দিক ছাড়া অন্য কিছু দেখে না। আবার অপছন্দকারীও তার অপছন্দের বিষয়ে ক্ষতির দিকই বেশি দেখে। কবি বলেন,

সন্তুষ্টির চক্ষু সব ক্রটির ব্যাপারে ভোঁতা
অসন্তোষের চক্ষু সাম্যের ব্যাপারে বর্বর"

আল্লাহর হিকমতের দাবি হচ্ছে, এ পৃথিবীতে কল্যাণের সাথে অকল্যাণের সংমিশ্রণ করা। এক কল্যাণকে অন্য কল্যাণের উপর অথবা এক অকল্যাণকে অন্য অকল্যাণের উপর অগ্রাধিকার দেয়া অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের তুলনা করে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া। এসব কাজের জন্য এমন একজন সত্তা আবশ্যক যিনি সকল প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। কেননা তিনি বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী এবং যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন চান না।

এখানে আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যাবতীয় কল্যাণ তিনভাগে বিভক্ত ঃ

(এক) এমন কল্যাণ যাতে হালকা কষ্ট থাকা সত্ত্বেও শরীয়তপ্রণেতা কর্তৃক কল্যাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ সেখানে কল্যাণের পরিমাণ অধিক। যেমন কিছু কষ্ট থাকা সত্ত্বেও রোযার মধ্যকার কল্যাণ এবং সম্পদ ও জীবনের ত্যাগ সত্ত্বেও জিহাদের মধ্যকার কল্যাণ। তদ্রূপ হজ্জ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(দুই) এমন কল্যাণ যাকে শরীয়ত প্রণেতা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ তার ক্ষতিকর দিক কল্যাণের তুলনায় অধিক। যেমন মদ ও জুয়ার মধ্যকার কল্যাণ। আল্লাহ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا-

লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য উপকার। কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।'[৬]

অনুরূপ সুদের মধ্যকার কল্যাণ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সকল প্রকার সুদ হারাম করেছেন।

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

'আর আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।'[৭]

তদ্রূপ আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"[৮]

(তিন) এমন কল্যাণ যা শরীয়ত প্রণেতা বাতিল না করে নিরবতা পালন করেছেন। এ জাতীয় জনকল্যাণ মানুষের অভিজ্ঞতার আওতাধীন এবং এর দৃষ্টান্ত যুগে যুগে ও দেশে দেশে বিভিন্ন রকম।

অনুবাদ ঃ নাজমুল হুদা সোহেল

গ্রন্থপঞ্জি

১. শারকাসী হচ্ছে, তুরস্ক, সিরিয়া ও জর্দানের প্রাচীন জনগোষ্ঠীবিশেষ।

২. সূরা, যুখরুফ/২৩

৩. সূরা আন-নিসা/৮০

৪. সূরা আন-নিসা/৬৫

৫. ইমাম মুসলিম কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে হাদীসটির কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন (সহীহ মুসলিম ৪/১৮৩৫-১৮৩৬, তাহকীক মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, প্রকাশক ঈসা আল হালাবী)।

৬. সূরা বাকারা/ ২১৯

৭. সূরা বাকারা/ ২৭৫

৮. সূরা বাকারা/ ২৭৮-২৭৯

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন-২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ৯৭-১০০

ইসলামে পানি আইন ও বিধি-বিধান

মো. নূরুল আমিন

॥ তেরো ॥

সিরিয়া ঃ সমভূমি মালভূমি ও পাহাড় পর্বত মিলিয়ে সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের আয়তন হচ্ছে ১,৮১,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে তুরস্ক দক্ষিণে ইসরাইল ও জর্দান পূর্বে ইরাক এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও লেবানন অবস্থিত।

অবস্থানের ভিত্তিতে দুটি প্রধান এলাকা নিয়ে সিরিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত। এর পশ্চিমাঞ্চল হচ্ছে সরু পার্বত্য ভূখণ্ড এবং পূর্বাঞ্চল হচ্ছে অধিকতর প্রশস্ত মালভূমি যা ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূমধ্যসাগর বরাবর বিস্তৃত সিরিয়ার আরেকটি সমভূমি অঞ্চল তুরস্ক সীমান্ত থেকে লেবানন সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা দখল করে আছে। এই এলাকার বাসিন্দাদের মাছ ধরা হচ্ছে প্রধান পেশা। এই সমভূমির বিপরীতে রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের নুসাইরিয়া পাহাড়ী অঞ্চল যা অধিকতর উর্বর এবং ঘন বসতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এই দেশটির পূর্বাঞ্চল হচ্ছে রুক্ষ এবং মরুভূমি-প্রভাবিত। সিরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে রয়েছে লেবাননের পাহাড়শ্রেণী ও উর্বর হাওরান অধিত্যকা। এই অধিত্যকাটাই দামেস্কের দক্ষিণ পূর্ব দিকে গিয়ে জাবাল ডুরজ-এর সাথে মিলিত হয়েছে। সিরিয়ার ডুরজ সম্প্রদায় এখানেই বসবাস করে। সিরীয়ার মরুভূমি অঞ্চল পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হয়ে ইরাকের সাথে গিয়ে মিশেছে। এর মাঝখানে রয়েছে ইউফ্রেথিস নদী ও তার শাখা-প্রশাখা। জজিরা নামে খ্যাত উত্তর পূর্ব অঞ্চলে এ নদীর শাখা-প্রশাখাসমূহ বিশেষ করে খাবুর নদী হচ্ছে খাদ্যশস্য ও তুলা চাষের জন্য পানির প্রধান উৎস।

সিরিয়ার আবহাওয়া বৈচিত্র্যময়, মরুভূমি ও সমুদ্রের যৌথ প্রভাব এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলের দিকে তা আস্তে আস্তে হ্রাস পায় এবং লেবাননের পাহাড়ের দিক অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা খুবই কম। আধা-মরু অঞ্চলের শহর ও গ্রামসমূহের পানির প্রধান উৎস হচ্ছে পাহাড়ী ছড়া, কুয়া এবং সরকারী উদ্যোগে নির্মিত কৃত্রিম জলাশয় প্রভৃতি। হাজার হাজার বছর ধরে এসব এলাকার জন সাধারণ এই শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সিরিয়ার

লেখক : সম্পাদক, থট্স অন ইকোনমিক্স, আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কিছু পানি স্থাপনা আছে যে গুলো রোমান শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। দামেস্কের পানি সরবরাহ পদ্ধতির অন্যতম উৎস বরদা নদী থেকে নেয়া নালা বা কৃত্রিম প্রণালী রোমান আমলেই তৈরী।

প্রাচীনকাল থেকেই আবহাওয়া ও পানি সিরিয়ার জনসাধারণের জীবন যাপন এবং ভূমি ব্যবস্থার পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে আসছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের বদৌলতে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর কৃষি কাজ হয় এবং এ প্রেক্ষিতে এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কৃষকরাই হচ্ছে প্রধান। পক্ষান্তরে জামিরাহ এবং অরন্তি নদীর পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার কারণে কৃষি কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মরু অঞ্চলে যেখানে পানি সরবরাহ বা সেচের বিকল্প ব্যবস্থা নেই সেখানে স্থায়ী বসতির সন্ধান পাওয়া যায় না। বাসিন্দাদের বেশীর ভাগই যাযাবর। পশু পালন হচ্ছে তাদের প্রধান পেশা। এই অবস্থায় সেচ ভিত্তিক কৃষি কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এই এলাকায় রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে ষাট-এর দশকে ইয়াজমুক নদীর উৎস মুখের পানি ধরে রাখার জন্য জাজিরায় খাবুর নদী প্রকল্প মুজাইরিজ প্রকল্পসহ দক্ষিণাঞ্চলে সীন, অরন্তি, বরদা এবং আয়ওয়াজ নদীর উপর ড্যাম তৈরীর প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে ইউফ্রেতিস নদীর উপর তৈরী বাধ প্রায় ৫ লাখ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনতে সক্ষম হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সিরিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন সিরিয়া, ইসলামী যুগের সিরিয়া, ওসমানীয় সাম্রাজ্য, ফরাসী ম্যাণ্ডেট এবং স্বাধীনতা উত্তর তথা বর্তমান সিরিয়া।

ইতিহাসের উষা লগ্নে সিরিয়া ছিল সেমিটিকদের আবাসস্থল। কাল পরিক্রমায় খৃস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে কেনানী এবং মরুভূমির পৌরাণিক বাসিন্দারা এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের সাথে খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে এ্যামেরীয়রা এসে যোগ দেয়।

খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে মিশর ফিনিশিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে; এর অব্যবহিত পরেই সারা সিরিয়া মিশরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ ও চতুর্দশ শতাব্দিতে উত্তর দিক থেকে হিট্টি (Hittites) পূর্ব দিক থেকে আসীরিয়ান ও আরামীয়ানরা উত্তর ও মধ্য সিরিয়াসহ মেসোপটোমিয়ার বেশীরভাগ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দিতে আর্মিয়ানরা দামেস্কে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকেই পরবর্তী তিন শতাব্দি পর্যন্ত শাসনকাজ পরিচালনা করেছে। পারস্য সম্রাট কর্তৃক সিরিয়া দখলের মধ্য দিয়ে সিরিয়ার উপর সেমিটিক শাসনের অবসান ঘটে। তিন শতাব্দি পর সিরিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৩৩ অব্দে গ্রীকদের পরিবর্তে সেখানে রোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান আমলে সিরিয়ায় ব্যাপক সমৃদ্ধি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং হাওরান এলাকা কৃষি কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। রোমানরা

সারাদেশ জরিপ করে কৃষি ভূমির সম্ভাব্য উৎপাদনের ভিত্তিতে ভূমি রাজস্বের একটি কাঠামো প্রণয়ন করে যা পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনামলেও অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে ইসলামী শাসনামলে সিরিয়ায় গৃহস্থালী, পশু পালন সেচ ও শিল্প কাজে পানি ব্যবহারের বিস্তৃত নীতিমালা প্রণীত হয় এবং খাল নদী নালা খনন, কুয়া তৈরী এবং পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী করা হয়। ফলে দেশটির সমৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল। সিরীয়দের শক্তিমত্তা ভূমি সম্পদ, বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন উদ্ভাবন, শিল্পীদের কারুকাজ, সেচ প্রযুক্তি, বর্ণমালা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাদের অবদান বিশ্বব্যাপী তাদের জন্য খ্যাতি কুড়িয়েছিল। প্রথমতঃ সিরীয়রা ইহুদী ও পরে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। ৩৩০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট বাইজেন্টিয়ানে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন। এখান থেকেই বাইজেন্টাইনরা সিরিয়া শাসন করেছিলেন।

সপ্তম শতাব্দি নাগাদ আরব মুসলমানরা আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকে অবস্থিত দেশসমূহ জয়ের সূচনা করেন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের হাতে দামেস্কের পতন হয়। ৬৬১ সালে হযরত আলী রা. শহীদ হবার পর সিরিয়ার উমাইয়া গভর্নর নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করেন। উমাইয়াদের প্রায় শতাব্দি কালের শাসনামলে অধিকাংশ সিরিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরবী ভাষা আরামাইক ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উমাইয়ারা গ্রীক ও রোমানদের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়নি। ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং কল্যাণ-এর এই ধরনের সকল আইন তারা অব্যাহত রেখেছে। আইন প্রয়োগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইসলামী আইন অনুসরণ করা শুধু মাত্র মুসলমানদের জন্যই বাধ্যতামূলক ছিল। অমুসলমানদের তাদের নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী সিভিল আইন অনুসরণ করার অধিকার স্থল। সিরিয়ার জনসংখ্যার ৮০ ভাগ ছিল হানাফী মাযহাবভুক্ত সুন্নী এবং বাকী ২০ ভাগ শিয়া। খৃষ্টান বিদ্রোহ এবং ইরানীদের সমর্থনপুষ্ট পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের চাপে উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসেন এবং ৭৫০ সালে তারা খেলাফতের কেন্দ্রস্থল দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তর করেন। আব্বাসীয় শাসনামলে সিরিয়া নতুন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ১০৯৪ সালে সেলজুক তুর্কীদের হাতে শিয়াপন্থী আব্বাসী শাসকদের পতন ঘটে এবং মিশরের ফাতেমীরা দক্ষিণ সিরিয়া দখল করে নেয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ঐক্যে যে ফাটল দেখা দিয়েছিল ক্রুসেডখ্যাত কুর্দী নেতা সালাহউদ্দিন তা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ফাতেমীদের পরাজিত করেন এবং সেলজুকদের কাছ থেকে নেতৃত্ব তার কাছে চলে আসে। ১১৯৩ সালে গাজী সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর মুসলিম ঐক্যে আবার ফাটল ধরে, সিরিয়া কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত এগুলো মিশরের মামলুক সুলতানদের অধীনে চলে যায়। এর প্রায় ২৫০ বছর পর ১৫১৬ সালে সিরিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুসলিম শাসনামলের সিরিয়া এবং বর্তমান সিরিয়ার মধ্যে প্রচুর তফাৎ রয়েছে। এর শত শত গ্রাম এবং প্রায় ৩০ শতাংশ ভূখন্ড মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তবে বিদেশী ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জন্য সিরিয়া সর্বদা আকর্ষণীয় ছিল। উন্নতমানের মসল্লা, ফলমূল এবং বস্ত্র এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সাথে এই এলাকায় এসেছিল পশ্চিমা মিশনারী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং পর্যটকরা। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়ার সাথে সাথে পাশ্চাত্যের দেশগুলো এই মুসলিম দেশটির ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে।

১৫৩৫ সাল নাগাদ ফরাসীরা সিরীয় খৃষ্টানদের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পায়। একইভাবে ১৫৮০ সালে ইংরেজরাও এই অধিকার গ্রহণ করে এবং আলেপ্পোতে লেভান্ট কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ নাগাদ রুশরাও সিরীয় গ্রীকদের উপর Protective right দাবী করে। পরবর্তী শতাব্দি ছিল পশ্চিমা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের শতাব্দি। ১৮৬১ সালে সিরিয়া থেকে লেবাননকে আলাদা করে ফরাসী নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত সিরিয়া মিশরের দখলে ছিল এবং এই সময়ে সুলতান তার নাম মাত্র শাসনের অধীনে সরকার কাঠামো, বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং রাজস্ব খাতে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে সিরিয়াকে French mandate এর অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ও ফরাসী স্বার্থের সংঘাত সিরিয়ার পরবর্তী রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতি সংঘের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সিরিয়ায় ফরাসী ম্যাণ্ডেট কার্যতঃ শেষ হয়ে যায়। এই প্রস্তাবে ফ্রান্সকে সিরিয়া ছেড়ে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৬ সালের ১৭ এপ্রিল সিরিয়া সর্বপ্রথম Evacuation Day পালন করে। এই দিনটিকে এখনো তারা জাতীয় ছুটি হিসেবে পালন করে থাকে। বলাবাহুল্য স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম ১০ বছরে এই দেশটি দু'টি সংবিধান রচনা করেছে। এই সময়ে চারটি সামরিক বিপ্লব এবং ২০টি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক উত্থান পতন সত্ত্বেও দেশটির পানি আইনের পুরাতন কাঠামো এবং কৃষির তুলনামূলক শক্ত ভিত্তি তার গ্রামীণ জীবন যাত্রাকে ব্যাহত হতে দেয়নি। নদ-নদীর উপর বাঁধ ও ড্যাম তৈরী, পানি সরবরাহের ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা নির্মাণ এবং শহর ও পল্লী এলাকা পানির ব্যবহার বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ এই দেশটিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সমান্তরালে চলেনি। তবে বৃটিশ ও ফরাসী ম্যাণ্ডেটের আওতায় সিরিয়ার মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে, পানি সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক বেশ কিছু ওয়াকফ এস্টেটও ছিল। তা সত্ত্বেও সিরিয়ায় এসময়ে এ সংক্রান্ত ৩২ টি আইন ও ডিক্রি কার্যকর ছিল।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ১০১-১১৪

বাংলাদেশে শিশু শ্রম নিরসনে আইনগত পদক্ষেপ ঃ একটি পর্যালোচনা

নাহিদ ফেরদৌসী

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার ১৩% পাচঁ বছরের কম বয়সী শিশু, ৩৮% পনের বছরের কম বয়সী এবং ৪৭% আঠার বছরের কম বয়সী শিশু।[১] এদেশে অনেক সামাজিক সমস্যার মধ্যে শিশু শ্রম একটি অন্যতম সমস্যা। শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্র, সমাজ ও অভিভাবক সকলের মৌলিক দায়িত্ব। কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাই পিতামাতা, অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন শিক্ষক এমনকি পাড়া প্রতিবেশীর উপর তাদের সুস্থভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দারিদ্র্যের কারণে শিশুর পিতা মাতা বাধ্য হয় তাদের সন্তানকে বিভিন্ন শ্রমে পাঠাতে।[২] এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৭.৪ মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছে, যা পৃথিবীর সকল কর্মজীবী শিশুদের ৬.১৬ শতাংশ। তার মধ্যে ৩৩ লক্ষ শিশু সার্বক্ষণিকভাবে কর্মে নিয়োজিত থাকলেও ১৭ লক্ষ শিশু সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত।[৩] বাংলাদেশে ২০০২ সালে শ্রম ও জনশক্তি অধিদফ্তর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, সারাদেশে প্রায় এক কোটি শিশু শ্রমিক রয়েছে। এদের মধ্যে ৯৪ ভাগ শিশু অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং ৬ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট শিশু শ্রমিকের প্রায় ৬৬ ভাগ কৃষিতে, ৮ ভাগ শিল্প খাতে, ২ ভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, ১৪ ভাগ গৃহভৃত্য এবং বাকি দশভাগ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তবে শ্রমজীবী শিশুদের প্রায় ৪০ শতাংশই মেয়ে শিশু।[৪] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) প্রদত্ত এক জরিপে দেখা যায়, শিশু শ্রমের হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করে আছে এবং দেশে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ।[৫] অথচ শিশু শ্রম শিশুদের সুস্থ জীবনধারার সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে শিশুরা কিভাবে শ্রমমুখী হয়, শিশুশ্রমের ধরণ, শিশুদের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং এসব শিশু শ্রম প্রতিরোধে যে সকল প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক আইন ও

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

পদক্ষেপসমূহ রয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার প্রয়োজনেই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

২. শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স : বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞায় বিভিন্ন বয়সসীমা বর্ণিত আছে। শিশুদের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটানো বা সুরক্ষার লক্ষে নির্দেশনা দিয়েছে প্রায় ৩২টি আইন।[৬] এরমধ্যে শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী যার বয়স ১৬ বছরের নীচে সে শিশু হিসেবে গণ্য।[৭] অন্যান্য আইনের মধ্যে ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইনে ও ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানুষকে শিশু বলে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২ ধারায় শিশু অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন কোন ব্যক্তি এবং কিশোর অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন কোন ব্যক্তি। আবার জাতীয় শিশু নীতিমালা অনুযায়ী শিশুর বয়স সর্বোচ্চ ১৪ বছর ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষত ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘ শিশু সনদে যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের নীচে সে ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য। তবে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন শিশুর সংজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রচলিত অন্য কোন আইনকে উদ্ধৃত করেনি এবং ১৬ বছরের নীচের ব্যক্তিকে শিশু বলেছে।[৮] অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তিই শিশু।[৯]

৩. বাংলাদেশে শিশুশ্রমের কারণ : শিশু শ্রমের কারণ বিভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

১. অর্থনৈতিক কারণ : বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগান দেয়া অনেকাংশে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ পরিস্থিতিতে বয়সের কথা বিবেচনায় না রেখেই পিতার পেশায় বা অন্য কোন পেশায় সন্তান যদি নিয়োজিত হয় তাহলে পিতামাতা একে লাভজনক মনে করেন।[১০] অন্যদিকে শিশুদেরকে অল্প মজুরিতে দীর্ঘক্ষণ কাজে রাখা যায় বলে নিয়োগকর্তাও শিশুদেরকে কাজে নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

২. আর্থ-সামাজিক কারণ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও শিশুশ্রমের অন্যতম একটি কারণ। আমাদের সমাজে পরিবারের প্রধান তথা পিতার যদি মৃত্যু ঘটে তবে ঐ পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে। এ[illegible] পারিবারিক ভাঙ্গন বা বিচ্ছিন্নতায় পিতা-মাতা পৃথক বসবাস করলে সন্তানরা নিজে[illegible] কর্মের সন্ধান করে থাকে। গ্রামে কাজের সুযোগ না থাকা, সামাজিক অনিশ্চয়তা, মৌ[illegible] চাহিদা পূরণের অভাব, ইত্যাদি কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখী অভিবাসন করছে। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। এ জাতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি শিশুদের শ্রমমুখী করে তুলছে।[১১]

৩. শিক্ষার অভাব : অনেক সময় পিতামাতা স্বল্প শিক্ষা এবং অসচেতনতার কারণে সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করেনা । শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগের অভাব এবং শিশু শ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের অসচেতনতা ও উদাসীনতার কারণে শিশুশ্রম তীব্র আকার ধারণ করছে।

৪. বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ধরণ : বাংলাদেশে প্রধানত দু'টি সেক্টরে শিশু শ্রম বিরাজমান-

১. আনুষ্ঠানিক সেক্টর
যথা: শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, জাহাজ ভাঙ্গা, ইত্যাদি।

২. অনানুষ্ঠানিক সেক্টর
যথা: কৃষি, পশুপালন, মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ, গৃহকর্ম, নির্মাণকর্ম, ইটভাঙ্গা, রিকশাভ্যান, ইত্যাদি।

যে শ্রম দ্বারা শিশুরা মননশীলতা ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুখিন হয় এবং তাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় তাই শিশুশ্রম।[১২] জাতীয় শিশু শ্রমিক জরিপে (২০০২-২০০৩) দেখা গেছে, ৪ কোটি ২৪ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৪০.৬০% শিশু শ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। ২০০৬ সালের ৩০ জানুয়ারী শিশু অধিকার ফোরামের শিশু শ্রম বিষয়ক এক সেমিনারের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে ৬৬ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত। অর্থাৎ মোট ৩ কোটি ৬০ লাখ শিশুর ১৮ শতাংশই শ্রমবাজারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। এসব শিশু শ্রমিকদের মাঝে ৯৪ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং ৬ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। সারাদেশে শিশুরা প্রায় ৪৩০ ধরণের কাজে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানা, রাসায়নিক শিল্পকারখানা, ঝালাই কারখানা, ইলেকট্রিক ওয়ার্কশপ, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, গৃহ ও রাস্তা নির্মাণ কাজের মতো ৪৭ ধরণের কাজ সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।[১৩]

শ্রমশিশুর উপর আইএলও-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে-[১৪]

১.	মোট শ্রমশিশুর সংখ্যা	=	৪৭ লাখ
	(৫ হতে ১৪ বছর)	=	ছেলে শিশু ৩৪ লাখ
২.	এদের মধ্যে	=	মেয়ে শিশু-১৩ লাখ

৫. শিশু শ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব : শিশু শ্রম কেবল শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যই ক্ষতিকর নয় বরং মানসিক বৃদ্ধিরও ব্যাঘাত ঘটে।

শিশুরা অল্প বয়সে অমানবিক পরিশ্রমের ফলে অপুষ্টিতে ভোগে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়।

শিশুরা বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত থাকার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রমে নিযুক্ত থাকা শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সমাজের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

শিশুরা সমাজ এবং পরিবার থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে।

শিশুদের অসুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় বোধ তৈরীতে সাহায্য করে না ফলে সহজেই তারা অপরাধ জগতে প্রবেশ করে ফেলে।

৬. শিশু শ্রম নিরসনে বাংলাদেশের আইনের ভূমিকা

৬.১. সাংবিধানিক বিধান : বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪১ অনুচ্ছেদ-এ মানুষ হিসাবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষতঃ জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।[১৫]

৬.২. শিশু আইন, ১৯৭৪-এর বিধান : ১৯৭৪ সালে শিশু আইন এবং ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। শিশু আইন ১৯৭৪-এর ষষ্ঠ ভাগের ধারা ৪৪ (১) অনুযায়ী 'শিশুকে ভৃত্যের চাকুরী বা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করলে, তাকে শোষণ করলে, আটকে রাখলে, তার উপার্জনে জীবনধারণ করলে, তা দণ্ডনীয় অপরাধ।'

৬.৩. শিশু নীতিমালা : ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। এই শিশু নীতি শিশু অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের আর একটি মাইল ফলক। এ নীতিমালায়ও শিশুর সংজ্ঞা, শিশুর বয়স, তার অধিকারের পরিধি, নাবালকত্ব, অভিভাবকত্ব, শিশুর সম্পদের হেফাজত, দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শিশুর রক্ষাকবচ, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ন্যাশনাল প্লান অব একশন ফর চিল্ড্রেন (১৯৯৭-২০০২) কর্মপরিকল্পনা গঠন করা হয়।

৬.৪. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ : শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ ছিল অত্যন্ত জরুরি। তাই ২০০৬ সালে এই আইনটি সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে এ আইনে ২০০৮ সালের মধ্যে দেশের সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। এই আইনে ভবিষ্যতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৬.৫. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ : বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬- এ শিশু ও কিশোর এর সংজ্ঞা ও ৩য় অধ্যায়ের ধারা ৩৪-৪৪ এ কিশোর এবং শিশু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ

করা আছে। এ আইনে আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে কোন শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে যাদের বয়স ১৬-১৮ বছরের মধ্যে তারা কারখানা আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করতে পারবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ শ্রম আইন পাসের পূর্বে শিশু শ্রম সংক্রান্ত বেশ কিছু আইন ছিল, সেগুলো বাতিল করা হয়েছে, যা হলো: শিশু (শ্রম বন্ধক) আইন ১৯৩৩, মজুরী পরিশোধ আইন ১৯৩৬, শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন ১৯৩৮, সর্বনিম্ন মজুরী আইন ১৯৬১, কারখানা আইন ১৯৬৫, শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫ এবং শিশুদের নিয়োগ বিধিমালা ১৯৫৫।

শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশু ও কিশোর শ্রমিকরা সংক্রান্ত তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রমিক নিয়োগ, নিরাপত্তা ও কাজের ঘন্টা বিষয়ে বিধান রয়েছে। শ্রম আইনের কিশোর নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিধান অবশ্য পালনীয়। তাই কোন ব্যক্তি কর্তৃক এসকল ধারা লংঘন শ্রম আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সারণি ১

এক নজরে বাংলাদেশ শ্রম আইনে শিশু ও কিশোর শ্রমিক সংক্রান্ত বিধানসমূহ

অধ্যায়	ধারা	বিষয়বস্তু
তৃতীয় অধ্যায়	৩৪ ধারা থেকে ৪৪	কিশোর শ্রমিক নিয়োগ
ঊনবিংশ অধ্যায়	২৮৪, ২৮৫ ধারা	শিশু এবং কিশোর নিয়োগের জন্য দণ্ড

শ্রম আইনে শিশু ও কিশোরের সংজ্ঞা

ধারা ২(৬৩) : শিশু

শ্রম আইনের ২(৬৩) ধারায় 'শিশু' অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি। পূর্ববর্তী শ্রম আইনে শিশুর বয়স বিভিন্ন রকম ছিল।

সারণি ২

এক নজরে পূর্বের আইনসমূহে শিশুর বয়সের তারতম্যের চিত্র

পূর্বের শ্রম আইন	শিশুর বয়স
খনি আইন, ১৯৩৩	১৫ বছরের নীচের ব্যক্তি
শিশু আইন, ১৯৩৮	১৫ বছরের নীচের ব্যক্তি
শিশু নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৬৫	১৫ বছরের নীচের ব্যক্তি
চা বাগান শ্রমিক অধ্যাদেশ, ১৯৬২	১৫ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ব্যক্তি
কারখানা আইন, ১৯৬৫	১৬ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি
দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫	১২ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ব্যক্তি

ধারা ২(৮) : কিশোর

কিশোর অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেছেন কিন্তু আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করেননি এমন কোন ব্যক্তি।

ধারা ৩৪ : শিশু ও কিশোর নিয়োগে বাধা-নিষেধ

১. কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেয়া যাবে না।

২. কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেয়া যাবে না, যদি না-

ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একজন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তাকে প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়ণপত্র মালিকের হেফাজতে থাকে, এবং

খ) কাজে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি উক্ত প্রত্যয়ণপত্রের উল্লেখ সম্বলিত একটি টোকেন বহন করেন।

৩. কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরের শিক্ষাধীন হিসাবে অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

৪. সরকার যদি মনে করে যে, কোন জরুরি অবস্থা বিরাজমান এবং জনস্বার্থে এটা প্রয়োজন, তাহলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতে উল্লিখিত সময়ের জন্য উপ-ধারা (২) এর প্রয়োগ স্থগিত ঘোষণা করতে পারবে।

ধারা-৩৫ : শিশু সংক্রান্ত কতিপয় চুক্তির ব্যাপারে বাধা-নিষেধ

এই অধ্যায়ের বিধান সাপেক্ষে, কোন শিশুর মাতা-পিতা বা অভিভাবক শিশুকে কোন কাজে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করে কারো সাথে কোন চুক্তি করতে পারবেন না।

ধারা-৩৬ : বয়স সম্পর্কে বিরোধ

১) যদি কোন ব্যক্তি শিশু বা কিশোর কিনা - এই সম্পর্ক কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহলে পরিদর্শক প্রশ্নটি, কোন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সংশিষ্ট ব্যক্তির বয়স সংক্রান্ত প্রত্যয়ণপত্রের অবর্তমানে, কোন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করবেন।

২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন ব্যক্তির বয়স সংক্রান্ত প্রত্যয়ণপত্র তার বয়স সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-৩৭ : সক্ষমতা প্রত্যয়ণপত্র

১) কোন কিশোর কোন পেশা বা কোন প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য উপযুক্ত কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্য সংশিষ্ট কিশোর বা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক অনুরূদ্ধ হলে, অথবা কোন মালিক কর্তৃক অনুরূপভাবে অনুরূদ্ধ কোন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কিশোরটিকে পরীক্ষা করবেন এবং তার সক্ষমতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কিশোর বা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক উক্তরূপ আবেদন পেশকালে আবেদনটির সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠানে কিশোর চাকুরী প্রার্থী, সে প্রতিষ্ঠানের মালিক

কর্তৃক প্রদত্ত এই মর্মে পত্র সংযোজন করতে হবে যে, কিশোরটি সক্ষম বলে প্রত্যয়িত হলে তাকে চাকুরী প্রদান করা হবে।

২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন সক্ষমতা প্রত্যয়ণপত্র তা প্রদানের তারিখ হতে বারো মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩) উক্তরূপ প্রত্যয়ণপত্রের জন্য প্রদেয় ফিস মালিক প্রদান করবেন, এবং তা সংশ্লিষ্ট কিশোর বা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট হতে আদায় করা যাবে না।

ধারা-৩৮ : ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

যে ক্ষেত্রে কোন পরিদর্শক এরূপ মত পোষণ করেন যে -

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি কিশোর, কিন্তু তার সক্ষমতা প্রত্যয়ণপত্র নাই; অথবা

(খ) উক্তরূপ প্রত্যয়ণপত্রসহ কর্মরত কোন কিশোর প্রত্যয়ণপত্রে উল্লিখিত কাজের জন্য আর সক্ষম নয়; সেক্ষেত্রে তিনি নোটিশ মারফত মালিককে কোন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক কিশোরটিকে পরীক্ষা করাবার অনুরোধ করতে পারবেন, এবং কিশোরটি উক্তরূপ পরীক্ষান্তে সক্ষম বলে প্রত্যয়িত না হওয়া পর্যন্ত অথবা কিশোরটি আর কিশোর নয় এই মর্মে প্রত্যয়িত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কাজ না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

ধারা-৩৯ : কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধা

কোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় তা পরিষ্কারের জন্য, তাতে তেল প্রদানের জন্য বা তাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলোর মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘূর্ণায়মান অংশগুলোর মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করতে অনুমতি দেয়া যাবে না।

ধারা-৪০ : বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ

১. কোন কিশোর যন্ত্রপাতির কোন কাজ করবে না, যদি না -

   ক) তাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল করানো হয়; এবং

   খ) তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, অথবা তিনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানেকাজ করেন।

২. এই বিধান কেবল মাত্র ঐ সকল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে, যে সম্পর্কে সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করে যে, এইগুলো এমন বিপজ্জনক যে এতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিশোরের পক্ষে কাজ করা উচিত নয়।

৩. সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা প্রকাশ করবে ঐ সকল কাজে কোন কিশোর কিশোরীকে নিয়োগ করা যাবে না।

ধারা-৪১ : কিশোরের কর্ম-ঘন্টা

১. কোন কিশোরকে কোন কারখানা বা খনিতে দৈনিক পাঁচ ঘন্টার অধিক এবং সপ্তাহে ত্রিশ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করতে দেয়া যাবে না।

২. কোন কিশোরকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক সাত ঘন্টার অধিক এবং সপ্তাহে বিয়াল্লি-শ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করতে দেয়া যাবে না।

৩. কোন কিশোরকে কোন প্রতিষ্ঠানে সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা হতে সকাল ৭.০০ ঘটিকার মধ্যবর্তী সময়ে কাজ করতে দেয়া যাবে না।
৪. যদি কোন কিশোর অধিককাল কাজ করেন, তাহলে অধিককালসহ তার কাজের মোট সময় -
ক) কারখানা বা খনির ক্ষেত্রে, সপ্তাহে ছত্রিশ ঘন্টা;
খ) কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টা এর অধিক হবে না।
৫. কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরের কাজের সময় দুটি পালায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, এবং কোন পালার সময়সীমা সাড়ে সাত ঘন্টার বেশী হবে না।
৬. কোন কিশোরকে কেবলমাত্র একটি রীলেতে নিয়োগ করা যাবে এবং পরিদর্শকের নিকট হতে লিখিত পূর্ব অনুমোদন ছাড়া ত্রিশ দিনের মধ্যে তা একবারের বেশী পরিবর্তন করা যাবে না।
৭. এই আইনের অধীন সাপ্তাহিক ছুটি সংক্রান্ত বিধান শ্রমিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং এই বিধান কিশোর শ্রমিকের ক্ষেত্রে স্থগিত করা যাবে না।
৮. একই দিনে কোন কিশোর একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবে না।

ধারা-৪২ : ভূ-গর্ভে এবং পানির নীচে কিশোরের নিয়োগ নিষেধ
কোন কিশোরকে ভূ-গর্ভে বা পানির নীচে কোন কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

ধারা-৪৩ : কিশোরের কাজের সময়ের নোটিশ
১) কোন প্রতিষ্ঠানে কিশোর শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে এতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিশোরের কর্মঘণ্টা সম্পর্কে, তাদের কাজের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখসহ, একটি নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে।
২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশে প্রদর্শিত সময়ে কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের ক্ষেত্রে যেভাবে স্থির করা হয় সেভাবে স্থির করতে হবে, এবং এটা এমন হবে যেন উক্ত সময়ে কর্মরত কোন কিশোরকে এই আইনের খেলাপ কোন কাজ করতে না হয়।
৩) কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
৪) সরকার বিধি দ্বারা উক্ত নোটিশের ফরম এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

ধারা-৪৪ : কতিপয় ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগে ব্যতিক্রম
১) এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, বারো বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত কোন শিশুকে এমন কোন হালকা কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে যা তার স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য বিপজ্জনক নয়, অথবা যা তার শিক্ষা গ্রহণকে বিঘ্নিত করবে না:
তবে-শর্ত থাকে যে, শিশু যদি বিদ্যালয়গামী হয় তাহলে তার কর্ম সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তা তার বিদ্যালয় গমনকে বিঘ্নিত না করে।

২) কিশোর শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই অধ্যায়ের সকল বিধান যতদূর সম্ভব, উক্ত শিশু শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ২৮৪ : শিশু এবং কিশোর নিয়োগের জন্য দণ্ড

কোন ব্যক্তি কোন শিশু বা কিশোরকে চাকুরীতে নিযুক্ত করলে, অথবা এই আইনের কোন বিধান লংঘন করে কোন শিশু বা কিশোরকে চাকুরী করার অনুমতি দিলে, তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

ধারা ২৮৫ : ধারা ৩৫ লংঘন করে শিশু সম্পর্কে কোন চুক্তি করার দণ্ড

কোন শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক ধারা ৩৫ এর বিধান লংঘন করে কোন শিশু সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন করলে তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন।[১৬]

কিন্তু এসব আইন পাসের পরও সারাদেশে শিশুদের বিশেষ করে কর্মজীবী শিশুদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি বরং শিশু নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ, শিশু শ্রমিকদের শোষণ, গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপর নির্যাতন প্রভৃতি ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের প্রতি সদয় আচরণের মানবিক মূল্যবোধটুকুও যেন অনেকে হারিয়ে ফেলেছে।

৭. শিশু শ্রম নিরসনে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC), আইএলও কনভেনশন ১৮২-সহ শ্রম সংক্রান্ত তেত্রিশটি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে।

বিশ্বব্যাপী শিশুদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষে ১৯৫৩ সাল থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারে 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালিত হয়ে আসছে।

১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে শিশুদের ১০টি অধিকার ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে, তার মধ্যে ৪১টি ধারা শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত এবং বাকি ১৩টি ধারায় সনদের অন্তর্নিহিত সাধারণ নীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে।

শিশু অধিকার সনদের ৩১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু বিশ্রাম, অবসর যাপন, বয়স অনুযায়ী খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক, সুকুমার শিল্পে অংশগ্রহণের অবাধ অধিকার অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করবে।

শিশু অধিকার সনদের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে। স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর অথবা শিশুর শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটায় অথবা বিপদ আশঙ্কা করে এমন কাজ যেন না হয় তার ব্যবস্থা নেবে।'

অনুচ্ছেদ ৩৭ (ক) এ বলা হয়েছে, 'কোন শিশুই নির্যাতন কিংবা কোন প্রকার নির্দয়, অমানবিক বা অসম্মানজনক আচরণ বা শাস্তিরও শিকার হবে না। ১৮ বছর বয়সের নিচে কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড বা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না।[১৭] ২০০০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইলও'র) ১৮২ নং কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে।

৮. শিশু শ্রম নিরসনে আইএলও কনভেনশনের ভূমিকা

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও-র সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০২ সালের জন্য আইএলও'র গভর্নিং বডির উপ-সদস্য নির্বাচিত হয়। আইএলও-র বিধি অনুযায়ী শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। আইএলও-র কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত যে কোনো মানুষকে শিশু ধরা হয়। বাংলাদেশ আইএলও র ৮টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে ৭টিসহ মোট ৩৯ টি কনভেনশনে অনুসমর্থন করছে।

সারণি ৩

আইএলওর মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনসমূহ যা বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত হয়েছে[১৮]

শ্রমমান	কনভেনশন	অনুসমর্থনের বছর
সংঘবদ্ধ হওয়ার	কনভেনশন ৮৭:সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা	১৯৭২
স্বাধীনতা ও	ও সংগঠনের অধিকার কনভেনশন, ১৯৪৮	
সংগঠনের অধিকার	কনভেনশন ৯৮: সংগঠন করার ও যৌথ	১৯৭২
	দর কষাকষি অধিকার কনভেনশন, ১৯৪৯	
বলপ্রয়োগমূলক	কনভেনশন ২৯: বল প্রয়োগমূলক শ্রম	১৯৭২
শ্রমের বিলোপ	কনভেনশন, ১৯৩০	
সাধন	কনভেনশন ১০৫: বল প্রয়োগমূলক শ্রমের বিলোপ সাধন কনভেনশন, ১৯৫৭	১৯৭২
বৈষম্য বিলোপ	কনভেনশন ১০০: সমপারিশ্রমিক কনভেনশন, ১৯৫১ কনভেনশন ১১১: বৈষম্য চাকুরী ও পেশা কনভেনশন, ১৯৫৭	১৯৯৮ ১৯৭২
শিশু শ্রম নিরসন	কনভেনশন ১৩৮: নূন্যতম বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন ১৮২: অত্যন্ত খারাপ ধরণের শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন, ১৯৯৯	অনুসমর্থিত না ১৯৯৯

সূত্র: আইএলও ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহীত, ২০০৯।

বাংলাদেশ শিশুশ্রম নির্মূল সংক্রান্ত ১৮২ নং আইএলও কনভেনশন, ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ১৯৮৪ সালের নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ অনুমোদন করেছে।

অত্যন্ত খারাপ ধরণের শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন, ১৯৯৯-এর উদ্দেশ্য শিশু শব্দটি ১৮ বছরের কম বয়সের সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এ কনভেনশনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত খারাপ ধরণের শিশুশ্রম বলতে বুঝায় ঃ

(ক) সকল ধরণের দাসত্ব, এবং দাসত্ব সদৃশ সকল কাজ যেমন শিশু বিক্রয় ও পাচার, ঋণ দাসত্ব এবং ভূমি দাসত্ব এবং সশস্ত্র বিরোধে ব্যবহারের জন্য বলপ্রয়োগমূলক কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে শিশুদের নিয়োগ, বলপ্রয়োগমূলক কিংবা বাধ্যতামূলক শ্রম।

(খ) বেশ্যাবৃত্তির জন্য, অশীল ছবি তৈরীর জন্য কিংবা অশীল দেহভঙ্গী প্রদর্শনের জন্য কোন শিশুর ব্যবহার, সংগ্রহ কিংবা প্রদান।

(গ) শিশুকে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিশেষত সংশিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে নিরূপিত ড্রাগ তৈরী বা পাচারের জন্য ব্যবহার সংগ্রহ কিংবা প্রদান।

(ঘ) যে সকল কাজ প্রকৃতিগতভাবে কিংবা যে অবস্থায় তা করা হয়, তা শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কিংবা নৈতিকতার পক্ষে হানিকর।

এ কনভেনশন অনুসারে ১২ বছরের কম বয়সী কোন শিশুই কাজের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। অথবা ১২-১৪ বছর বয়সী যে সকল শিশু পরিশ্রমী কাজের সাথে যুক্ত সেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এভাবে আইএলও -র নীতিমালা অনুযায়ী শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদেও একই কথা বলা হয়েছে।

৯. পর্যালোচনা

২০০৩ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৭৪ লাখ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এরপর জাতীয় পর্যায়ের আর কোনো জরিপ হয়নি। বর্তমানে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাস্তবে শ্রমজীবী শিশুদের শতকরা ৯৩ ভাগই বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। ১৫৪টি দেশ শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে শিশুদের বয়সসীমাসংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৩৮-এ অনুস্বাক্ষর করেনি বলে বাংলাদেশে এখনো ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা শিশু শ্রমের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই কোনো শিশুকে কাজ থেকে বিরত রাখতে হলে তার পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে হবে এবং শিক্ষার পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

সরকার শিশু শ্রম নীতিমালা, ২০০৭- এ অনুমোদন না করায় দেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য আইনগত পদক্ষেপ নেয়া সহজ হচ্ছে না।

সকল আন্তর্জাতিক আইনে শিশুদের বয়সসীমা ১৮ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করলেও বাংলাদেশ সরকার এ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে ১৯৯৪ সালের শিশু নীতিমালায় শিশুর বয়সসীমা ১৪ বছর নির্ধারণ করেছিল। ২০০৩ সালে এসে মন্ত্রিপরিষদের সভায় শিশুর বয়সসীমা ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সঙ্গতি রেখে ফৌজদারী আইন থেকে শুরু করে যানবাহন ব্যবহার বা শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এখনো আনা হয়নি। বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত থাকায় শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ হচেছ না। যে কারণে এখনো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থে শ্রম ও জনশক্তির হিসাব দেয়ার সময় ১৪ বছরের উর্ধ্বে শিশুদেরকে কর্মক্ষম জনশক্তির অন্তর্ভূক্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের শিশুশ্রমসংক্রান্ত প্রচলিত আইনগুলোতে শিশুর বয়স নিয়ে সঠিক নির্দেশনা না থাকায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

আইএলও কনভেনশন -১৮২ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী কাউকে শ্রমে নিয়োগদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য এ আইনের প্রয়োগ হয়না। দেশে বর্তমানে প্রায় ১৭ লক্ষ শিশুশ্রমিক সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যেমন- যন্ত্র, উচ্চ তাপমাত্রা, এসিড, গৃহপরিচারিকা, পাচার ইত্যারি সাথে যুক্ত রয়েছে। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের ক্ষেত্রগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রমের অবসানের বিষয়ে নীতিগতভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিশু আইনগুলো যথাযথ প্রয়োগে অনীহার কারণে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। তাছাড়া এসব আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড অথবা তিন মাসের কারাদণ্ড । যে কারণে আইনগুলো সহজেই মালিক পক্ষ লঙ্ঘন করে।

শ্রমজীবী শিশুরা মালিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য পায় না।

১০. বাংলাদেশে শিশু শ্রম নিরসনে কতিপয় সুপারিশ

শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত আইন সমূহের সঠিক প্রয়োগ।

শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন করার কৌশলগত কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে শিশুশ্রমনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিটি (খসড়া) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে খসড়া তৈরী হয়েছে। বর্তমানে এটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

শিশুর সঠিক ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দরকার অর্থাৎ কোন্ বয়সের শিশুদের শিশু বলা হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

শিশুর হালকা কাজ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সর্ম্পকে ব্যাখা থাকা প্রয়োজন।

কোন প্রতিষ্ঠানে কাজের কী ধরনের পরিবেশ থাকলে শিশুরা কাজ করতে পারবে, সে বিষয়গুলো স্পষ্ট থাকা দরকার।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ফলে শিশুটির যেসব ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিশুশ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্যে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন এবং শিশুশ্রম বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ (hazardous) এবং নিকৃষ্ট ধরনের (worst form) শিশুশ্রম নির্মূল করার নিমিত্ত সময়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরির পরিকল্পণা গ্রহণ করতে হবে।

১১. উপসংহার

শিশুরা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দৈহিক ও মানসিকভাবে একটি সুস্থ শিশু একটি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে নষ্ট হয়ে যাক এবং ভবিষ্যতের সাবলীল ও সুস্থ সমাজ জীবনে প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য হতে পারে না। শিশু শ্রম নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা সমাজের দায়িত্ব। কারণ আগামীতে যে শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবে, যার মেধা, জ্ঞান, কীর্তিতে সভ্যতার পথ আরও দীর্ঘ হবে তার বিকশিত হওয়ার জন্য চাই নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা।

তথ্যপঞ্জি

১. *Third and Fourth Periodic Report of the Government of Bangladesh under the Convention on the rights of the Child*, (Dhaka: Minstry of Women and Children Affairs, 2007), p.11

২. মাহবুবুর রহমান মজনু, "*শ্রমজীবি শিশুদের মুখোমুখি সুশীল সমাজ*" সাক্ষরতা বুলেটিন, মে ২০০৬, পৃ. ১১।

৩. ওয়াহিদা বানু "*শিশুর প্রতি যত্নশীল হউন, শিশুশ্রম প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন,*" সাক্ষরতা বুলেটিন-৭; নভেম্বর ২০০৬ ঢাকা, পৃ.৪৯।

৪. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৩ মে ২০০৪ ।

৫. আইএলও-র রিপোর্ট, ২০০৭।

৬. The Majority Act 1875, The Contract Act 1872, The Guardians and Wards Act 1890, The Orphanages and Widows Homes Act 1944, The Criminal Procedure Code 1890, The Juvenile Smoking Act 1919, The Child Marriage Restraint Act 1929, The Children Act 1974, National Children Policy (NCP) 1994, The Women and Children Oppression (Suppression) Act, 2000.
৭. শিশু আইন ১৯৭৪, ধারা ২(ক)
৮. শিশু আইন ১৯৭৪, ধারা ২ ।
৯. জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯।
১০. Mohammad Ali Khan, "*Child Labour in Dhaka City*", (Dhaka:Hakkani Publishers,2001), p.45.
১১. জাতীয় শিশু শ্রম নীতি, ২০০৭ (খসড়া) ।
১২. Khaleda Salahuddin, " *Child Labour in Bangladesh: The Early Years*", (Dhaka: Palok Publishers & Bangladesh Women Writers Association, 2001), p. 18.
১৩. শিশু অধিকার ফোরামের রিপোর্ট , ২০০৬।
১৪. আইএলও-র রিপোর্ট, ২০০৬।
১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২।
১৬. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬।
১৭. শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, অনুচ্ছেদ ৩১, ৩২, ৩৭।
১৮. ILO website: http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/ declworld.htm

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫-১১৬

॥ রিসার্চ রিপোর্ট ॥

ইসলামী আইন গবেষক ও লেখক তৈরীর জন্য শিক্ষার শেষ বর্ষে থিসিস বাধ্যতামূলক করা জরুরী - শাহ আব্দুল হান্নান

ইসলামী আইন গবেষণার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লেখক ও গবেষকের অভাব একটি অন্যতম সমস্যা। তাই লেখক তৈরী করার জন্য কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার সমাপনী বর্ষে সমসাময়িক যেকোন বিষয়ে একটি থিসিস বাধ্যতামূলক করা জরুরী। এতে শিক্ষর্থীরা গবেষণা নীতিমালার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং তাদের ইল্‌মী দক্ষতাও বাড়বে। গত ২০ মার্চ, শনিবার 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এর উদ্যোগে আয়োজিত 'ইসলামি আইন গবেষণাঃ সমস্যা ও উত্তরণ ভাবনা'- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ফিকহের পুরনো কিতাব সমূহের পাশাপাশি আধুনিক লেখকদের কিতাবও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইসলামী আইন সকল যুগ ও স্থানের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের যাবতীয় আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র এতটুকুই পরিবর্তন করতে হবে যতটুকু শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। রাসূল স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনও বিজিত দেশের যেসব আইন ও প্রচলিত রীতি শরীয়ত বিরোধী নয় তা বহাল রেখেছিলেন। তাই আধুনিক যুগেও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে সিটি কর্পোরেশন আইন, ওয়াসা আইন, বিদ্যুৎ আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইনসহ বহু বিষয়ে খুব বেশী পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না।

স্বাগত বক্তব্যে সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে ১৭ জন সদস্য নিয়ে এ সংস্থা যাত্রা শুরু করে। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে অস্পষ্টতা ও সংশয় রয়েছে তা দূর করার জন্য সংস্থা বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

মত বিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. ছাইদুল হক, আব্দুল মান্নান তালিব, এডভোকেট সফিক আহমেদ, এডভোকেট নুরুজ্জামান, মাওলানা

মোহাম্মদ মূসা, মাওলানা নুরুল্লাহ, মির্জা সিকান্দার আলী, আজহারুল ইসলাম হাবীব, মাওলানা শামাউন আলী, এডভোকেট সাজ্জাদ সারোয়ার, এডভোকেট মোহাম্মদ আসাফুর আলী রাজা প্রমূখ।

ড. ছাইদুল হক তার আলোচনায় বলেন, ফিকাহ্ শব্দের প্রায়োগিক অর্থ যে আইন হয় তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। এ জাতীয় অসংখ্য অস্পষ্টতা দূর করার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীন তৎকালীন সমাজে কিভাবে ইসলামী আইন প্রয়োগ করেছেন তা নিয়ে আরো গবেষণা হওয়া দরকার। আব্দুল মান্নান তালিব বলেন, ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা ছাড়া আমাদের লক্ষ সফল হবে না। তিনি বলেন, অপরিবর্তনীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানে আইন তৈরী করা মুজতাহিদদের কর্তব্য। এডভোকেট সফিক আহমেদ বলেন, ইসলামী আইনের প্রতি গণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। এডভোকেট নুরুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সুলিখিত আকারে মানুষের সামনে পেশ করতে হবে। মাওলানা নুরুল্লাহ বলেন, ইসলামের বেশির ভাগ আইন 'তাযীরাত' এর সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী আইন গবেষণায় অর্থনৈতিক সমস্যা অন্যতম বাধা। তিনি আরো বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য সৃষ্টি হলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করতে হবে। মির্জা সিকান্দার আলী বলেন, ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে যে রূপ প্রচারণা রয়েছে, পক্ষে তদ্রুপ প্রচারণা নেই। আজহারুল ইসলাম হাবীব বলেন, ইসলামী আইন গবেষণা বেগবান করার জন্য উসূলে ফিকাহর পুনঃপর্যালোচনা করা দরকার। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, শরীয়তের মাকাসিদ যুগে যুগে ভিন্ন হতে পারে। মাওলানা মূসা বলেন, কুয়েত সরকারের তত্ত্বাবধানে সংকলিত 'আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা' বা ইসলামী ফিকাহ বিশ্বকোষ ইসলামী আইন গবেষণার নতুন দ্বারা খুলে দিয়েছে। এটি দ্রুত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা দরকার। শামাউন আলী বলেন, ইসলামী আইন বিষয়ক আরবী ও ইংরেজীতে রচিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পারলে গবেষণা সহজ হয়ে যাবে।

মতবিনিময় সভায় সকল বক্তা ইসলামী আইন গবেষণায় বাস্তব সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে এর সমাধানে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা সকলেই একমত হন যে, শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আইন গবেষণার বিকল্প নেই।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন-২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭

প্রশ্নোত্তর

❑ **তারেক মুহাম্মদ যায়েদ, শ্যামলী, ঢাকা**

প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে যে ইসলামী আইন অপরিবর্তনশীল। প্রচলিত আইনে (Amendment) সংশোধনের যে সুযোগ রাখা হয়েছে তা কি ইসলামী আইনেও রয়েছে? যদি ইসলামী আইনও সংশোধিত হয় তাহলে সেটাকে আল্লাহ্র আইন বলা যাবে কি? বুঝিয়ে বললে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ 'ইসলামী আইন অপরিবর্তনশীল' কথার অর্থ হলো যেসব বিষয়ের বিধি-বিধান আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে এবং রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাদীসে স্পষ্টভাবে, কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ না রেখে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন সেগুলো চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে। তবে তা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এই আইনের একটি অংশ সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় এবং আরেকটি অংশের জন্য পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতায় বিকল্প ব্যবস্থা দেয়া আছে।

বিকল্প ব্যবস্থাযুক্ত আইনের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় শূকরের গোশত, মৃত জীব ও রক্ত ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করেছেন চিরকালের জন্য (দ্র. সূরা বাকারা, ১৭৩ নং আয়াত)। কিন্তু মানুষ যদি কোনো মারাত্মক সংকটে পতিত হয়ে খাদ্যাভাবে মরণোন্মুখ হয় কেবল সেরূপ অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে ওগুলো ভক্ষণ করে জীবন রক্ষা করতে পারে, এটা তার জন্য অনুমোদিত (একই বরাত দ্র.)। যেমন নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন থেকে পাঠ করতে হবে, এটা ফরয। কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় তা না পড়লে সম্পূর্ণ নামাযই বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু কোনো ওজরবশত কেউ দাঁড়াতে সক্ষম না হলে তার পক্ষে যে অবস্থায় তা পড়া সম্ভব সেই অবস্থায় পড়বে।এটা ব্যতিক্রম। ইবাদত, লেনদেন, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় বহু অপরিবর্তনীয় বিধান আছে।

সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় আইনের দৃষ্টান্ত

উত্তরাধিকারের বেলায় আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান করেছেন (দ্র. ৪ঃ১১ ও ১৭৬ নং আয়াত)। এটি সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় আইনের একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান। এটিও সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয় আইনের আরেক দৃষ্টান্ত। কারণ কুরআন মজীদে 'উলুল আমর' (সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ)-কে মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে বহু স্থানে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. সূরা নিসা, ৫৯ নং আয়াত)।

ইসলামী আইনে সংশোধন বা পরিবর্তনের সুযোগ

বর্তমান কালে বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ দেশের কোনো কোনো আইনের সংস্কার সাধন করে তার পরিবর্তে নতুন আইন প্রবর্তন করে। ইসলামী আইনের বেলায়ও এরূপ সুযোগ আছে। বিশেষ করে ফকীহগণের ইজতিহাদ প্রসূত আইনের বেলায় এটি প্রযোজ্য। উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বিবাহের কাবিননামা

বিবাহের কাবিননামা বলতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের চুক্তিপত্রকে বুঝায়। উল্লেখ্য যে, বিবাহ একটি সামাজিক পবিত্র চুক্তি। আল-কুরআনে চুক্তিপত্র লিখিত আকারে হওয়ার এবং সাক্ষী রাখার নির্দেশ রয়েছে (দ্র. সূরা বাকারা, ২৮২ নং আয়াত)।

ইসলামী আইন মতে যে কোনো চুক্তি লিখিত আকারেও হতে পারে এবং মৌখিকও হতে পারে। ইসলামী আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) কুরআনের আয়াতের আলোকে বলেছেন যে, যে কোনো চুক্তি লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া মুসতাহাব (সর্বোত্তম)।

কিন্তু কালের প্রবাহে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার বিচারে যে কোনো চুক্তিপত্র লিখিত আকারে হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে সত্য ও বাস্তব বিষয়কে সরাসরি অস্বীকার করতে এবং মিথ্যা কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই ইসলামী আইনবেত্তাগণের মতে চুক্তিপত্র লিখিত আকারে হওয়া মুসতাহাব হওয়ার বিষয়টি অতি আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) হয়ে পড়েছে। বিবাহ চুক্তির সাথে ওয়ারিসী স্বত্ব (ফরয), দেনমোহর (ফরয), খোরপোষ (ফরয), সন্তানের মাতৃত্ব-পিতৃত্ব নির্ণয় (ফরয) এবং পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের (ওয়াজিব) বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঐচ্ছিক বিষয়টি বিভিন্ন কারণে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি হলো আইনের সংস্কারের ও সংশোধনের উদাহরণ। এটি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে হওয়ায় ইসলামী আইনের অংশ।

❑ **আবু আম্মার, মীরহাজীরবাগ, ঢাকা**

প্রশ্ন ঃ একজন 'ফকীহ' এবং একজন 'মুফতী' এর মধ্যে কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ফকীহ্ ও মুফতীর মধ্যকার পার্থক্য

একজন ফকীহ্ একই সাথে মুফতীও হতে পারেন, কিন্তু একজন মুফতী ফকীহ্ নাও হতে পারেন। ইসলামী আইনের উচ্চতর গবেষণায় নিরন্তরভাবে জীবনের এক উল্লেখযোগ্য কাল অতিবাহিত করে যিনি এক বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়েছেন এবং আইনের বিষয়ে যিনি যথার্থ সমাধান দিতে পারদর্শী–আমরা তাকেই ফকীহ্ বলে স্বীকার করে নেই।

পক্ষান্তরে মুফতী সাহেবের নিকট কোনো আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এই বিষয়ে ফকীহ্ কি মত ব্যক্ত করেছেন তা খুঁজে বের করে তদনুযায়ী ফতোয়া দেন। এক্ষেত্রে তার কাজ গবেষণার পর্যায়ভুক্ত নয়, বরং আইনের কিতাব থেকে প্রদত্ত সমাধান খুঁজে বের করা তার কাজ। তবে তিনিও নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে ফকীহ্-এর স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

❑ **আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ নুমান, আমেরিকা**

প্রশ্ন ঃ যে কোন দেশের সংবিধানে এমন সব মূলনীতি পাওয়া যায় যদ্বারা ঐ দেশ পরিচালিত হয় ও অন্যান্য আইন রচিত হয়। আল-কুরআনও পরিপূর্ণ একটি সংবিধান (দসতুর)। আমার প্রশ্ন হলো, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআনের পাশাপাশি অন্য আরেকটি সংবিধান লিখিত আকারেও থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

উত্তর ঃ যদিও আমরা বলি, আল-কুরআন আমাদের সংবিধান, তার অর্থ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুরআনের নিজস্ব স্টাইলে, বর্তমান কালের মানবরচিত সংবিধানের মতো তা একত্রে ও ধারাবাহিকভাবে উক্ত হয়নি। বর্তমান কালের সংবিধানের ন্যায় কেউ পুস্তকাকারে ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন করতে চাইলে তিনি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো কুরআন মজীদে পেয়ে যাবেন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ হাদীস ও ফিকহ্-এর কিতাবসমূহে খুঁজে পাবেন।

লেখক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১. ত্রৈমাসিক 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায় লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা ইসলামী আইন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে হতে পারে। তবে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বীমা ও তুলনামূলক আইনী পর্যালোচনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. চলিত ভাষায় লিখতে হবে।

৩. গবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৪. আয়াতের আরবী (হরকতসহ) দিতে হবে এবং সূরা নং ও আয়াত নং উল্লেখ করতে হবে।

৫. হাদীসের ক্ষেত্রে মূল আরবীসহ তরজমা দিতে হবে, কিতাব (অধ্যায়), বাব (অনুচ্ছেদ) নং ও হাদীস নং প্রকাশক ও প্রকাশকালসহ দিতে হবে।

৬. অন্যান্য গ্রন্থের বেলায় লেখক, পুস্তক, খন্ড, প্রকাশক, প্রকাশের কাল ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।

৭. লেখা কাগজের এক পিঠে হতে হবে এবং সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় ফাঁক থাকতে হবে।

৮. লেখা মুদ্রিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে।

৯. অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

১০. সংস্থার ইমেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠানো যাবে। ই-মেইল প্রেরণ করে সংস্থার অফিসে ফোনে জানাতে হবে।

ই-মেইল- islamiclaw_bd@yahoo.com এবং
ফোন- ০১৭১৭ ২২০৪৯৮

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
নোয়াখালী টাওয়ার, (স্যুট-১৩/বি)
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার নতুন বিভাগ

প্রশ্নোত্তর

চালু হলো

ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। ইনশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে।

- সম্পাদক

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এর কার্যক্রম

০১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারীতা উপস্থাপন

০২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

০৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

০৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষাম্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষাম্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

০৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

০৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবি ভিত্তিক লেখক ফোরাম
গ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

০৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই / কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ

০৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
গ. ই-লাইব্রেরী
ঘ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় প্রতি সংখ্যা........কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ...

....

বয়স.................. পেশা..

ফোন/মোবাইল ঃ..................................সহজলভ্য মাধ্যম ঃ ডাক/কুরিয়ার ফরমের সঙ্গে................................টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর
গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট নং-১৩/বি, (লিফ্ট-১২), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩
E-mail : islamikclaw_bd@yahoo.com, www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয়।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ-১৬০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন ২০ কপির ঊর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৪০×৪=১৬০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ৪০×৮=৩২০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ৪০×১২=৪৮০/=

মেগাসিটিতে আপনার নিজ নিবাস খুজছেন?

রিহ্যাব হাউজিং ফেয়ার "০৯"

৫-৯ জানুয়ারী' ২০১০

উইন্টার গার্ডেন হোটেল শেরাটন

স্টল নংঃ ১৬

অভিজাত লোকেশনে
৭০০ - ২৫০০
ফ্ল্যাট প্লট বুকিং দিলেই
৫% - ১০% ছাড়!

ব্যাংক বিনিয়োগ @ ৭৫% *

রেডি ফ্ল্যাট এবং রেডি প্লট বুকিং চলছে!!!

ইন্টিমেট ইবনে সিনা হ্যাভেন	আদাবর, রোড-১০ (প্রস্তাবিত)
ইন্টিমেট বিলাস	সেক্টর-১২, উত্তরা
ইন্টিমেট সামারা সিদ্দিকা	মনেশ্বর রোড, জিগাতলা
ইন্টিমেট আল-হেরা	সেক্টর-১০, উত্তরা
ইন্টিমেট গার্ডেন	সেক্টর-১০, উত্তরা
ইন্টিমেট লালমাই	ব্লক-ই লালমাটিয়া
ইন্টিমেট হেরিটেজ	জাফরাবাদ, পশ্চিম ধানমন্ডি
ইন্টিমেট নূর-জাহান	শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর
ইন্টিমেট বি এম ভ্যালি	শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর
ইন্টিমেট ইশরাত	কাদেরাবাদ, মোহাম্মদপুর
ইন্টিমেট শাকুরা	প্লট # ২৮, আদাবর, রোড-১০
ইন্টিমেট ফেমাস	মনেশ্বর রোড, জিগাতলা
ইন্টিমেট প্যালেস	সেক্টর-১২, উত্তরা
ইন্টিমেট ফজিলাতুন্নেসা	সনাতনগড়, হাজারীবাগ
ইন্টিমেট ড্রিম	সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর

Price, Quality, Professionalism is our Pride

Intimate Properties Ltd.

Corporate Office : House # 65/A, Road # 6/A, Dhanmondi, Dhaka-1209
Ph : 8122977, 8125947, Cell : 01615-228443, 01674-746525
01678-711814, 01610-878353, Fax: +88-02-8121411
E-mail : intimateinfo@gmail.com, web :www.intimateproperties.com
Branch office : Alhaj Tower, 82, Motijheel (3rd Flloor), Dhaka-1000

MEMBER REHAB